মুহিব্বুল্লাহ

Boiwala

আদর্শ দ্বীনী পরিবার

বইওয়ালা

আদব ও শিষ্টাচার



Exclusive Presents

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুহতারামা আম্মাজান

সায়্যিদা খাইরুন নিসা বেহতর রহমাতুল্লাহি আলাইহা

ইমতিয়াজ

Acknowledgements & Fair Use Notice

Fair Dealing Disclaimer (Section 52, Indian Copyright Act, 1957)
This eBook is compiled and distributed for private study, research, and educational purposes only. This work is intended for non-commercial use and is shared under the "Fair Dealing" provisions of Section 52 of the Indian Copyright Act, 1957.

- Purpose: Education and Research (Section 52(1)(a)(i)).
- Nature: Non-commercial and non-profit.
  The copyrights of the original text, where applicable, remain with the respective authors and original publishers. This digital edition is created to facilitate easier access for students and seekers of knowledge.

Personal Intent & Grace
This digital edition was prepared solely for my own personal use and benefit. If our brothers and sisters find this work beneficial to their own learning and spiritual growth, then this is truly an Ehsan (Grace and Favor) from Allah Sub'hanahoo Wa Ta'ala. Any good within this work is from Allah, and any errors are my own.

Our Gratitude To:

- Islamic eBook Creator Team: (https://t.me/IslamicEbookCreatorTeam) for providing the platform and resources to create this eBook.
- islaMic_fdf: (https://t.me/islaMic_fdf) for the original source files (https://t.me/islaMic_fdf/2303) and materials.
- Zahid Hasan Bhai (@ZahidKhair): Special thanks for your constant support and brotherhood, from you I learned proofreading within the Islamic eBook Creator Team.

Support & Updates:

If you appreciate this work, please support the author by purchasing a hard copy.
To join my personal group for more eBooks and resources, click the link below:
🌐 Boiwala বইওয়ালা

Boiwala Presents......

এই বইটি এ আই (AI) এবং ম্যানুয়েল চেকআপ এর মাধ্যমে বানানো হয়েছে। যতটা সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে প্রুফ রিডিং করার। এরপরেও মূল বইয়ের কিছু শব্দ বা বাক্য পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং আমাদের ভালো গুলো কবুল করে নিন। যা কিছু ভুল ভ্রান্তি সব আমাদের তরফ থেকে আর যা কিছু সঠিক সমস্ত কিছু আল্লাহতালার তরফ থেকে।

বইওয়ালা নিবেদন.........

Contents

আদর্শ দ্বীনী পরিবার

আদব ও শিষ্টাচার

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুহতারামা আম্মাজান

সায়্যিদা খাইরুন নিসা বেহতর রহমাতুল্লাহি আলাইহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের কথা

একটা সময় ছিল যখন মুরুব্বীদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা করত। হৃদয়ের গভীর থেকে তাদেরকে সম্মান জানাত। গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করত। তাদের কথামতো চলতে পারাকে সৌভাগ্য মনে করত। বিয়ে-শাদী, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে সবাই তাদের থেকে দুআ নিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের নসীহত কামনা করত।

মুরুব্বীরাও ছিলেন অনেক জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। উন্নত চিন্তা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

কিন্তু সময় এখন বদলে গেছে। অতীত ও বর্তমানের ঘনিষ্ঠরেখা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবকিছুরই যেন নতুন সংজ্ঞা ও নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে। সেজন্য দেখা যায়, এখনকার ছেলেমেয়েরা 'মুরুব্বী' শব্দের সঙ্গেই পরিচিত না। যারা কিছুটা পরিচিত তারা এই শব্দের ভাব ও আবেদন সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না।

সময়ের এই পরিবর্তনের মূলে প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি নির্ভরতার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। অনেককেই দেখা যায় এখন গুগল 'শায়খ (!)' থেকেই সবকিছু নিতে চায়। ইন্টারনেটকেই সবকিছুর বিকল্প মনে করে। অনলাইনে যুক্ত হতে পারলেই নিজেকে স্বয়ংসম্পন্ন মনে করে। আর মুরুব্বীদেরকে মনে করে প্রাচীনপন্থী অতীতমুখী। আশঙ্কাজনক এই অবস্থা কবে দূর হবে কে জানে। [সাত]

কিংবা এই অবস্থা আরও কতদূর গড়াবে জানি না। সর্বোপরি এখনকার মানুষ শ্রদ্ধা সম্মানও খুব একটা বুঝে না।

মুরুব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং তাদেরকে মান্য করার ব্যাপারে দুঃখজনক অবহেলা বহু রকমের কল্যাণ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে। বহু ধরনের খারাবী আমাদের মাঝে ডেকে এনেছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, আমাদের সন্তানরা এখন আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাদেরকে সতর্ক ও শাসন করার কোনো ব্যবস্থা আমাদের হাতে নেই। এখন তারা তাদের ইচ্ছেমতো চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজেদের বুঝ ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। অন্যদেরকে এমনকি মা-বাবাকেও তারা তাদের পছন্দ-অপছন্দ মেনে নিতে বাধ্য করছে। এর ভয়ঙ্কর পরিণতি তো সবার চোখের সামনে!

এ বিষয়ে দীর্ঘ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে বর্তমানে যে কিতাবটি প্রকাশিত হচ্ছে সেটি আগাগোড়া মুরুব্বীদের সেই নসীহত, যা একসময় আমাদের জন্য বহু কল্যাণ লাভের মাধ্যম ছিল। ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে কামিয়াবী লাভের উসিলা ছিল। যে নসীহতগুলোর অভাবেই এখন আমাদের বিবেক বিবেচনা দুর্বল। বোধ ও উপলব্ধি কমজোর। রুচি ও চিন্তা বড় বেমানান।

কিতাবটির উর্দূ নাম 'হুসনে মুআশরাহ'। এটি লিখেছেন হিন্দুস্তানের উচ্চ পর্যায়ের ইলমী খান্দানে বেড়ে ওঠা এক মহীয়সী নারী। যার জীবনী বিষয়েও আমাদের মাকতাবা থেকে চমৎকার একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে 'মহীয়সী মা' নামে। তিনি মুআররিখে হিন্দ সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী রহ.-এর স্ত্রী এবং মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

রহ.-এর মা। তাঁর ছোট মেয়ে উর্দূ ভাষার বিখ্যাত কবি ও লেখিকা আমাতুল্লাহ তাসনীম রহ.।

কিতাবটি অনুবাদ ও কম্পোজ শেষ হওয়ার পর একটি প্রুফ আমিও আগাগোড়া দেখলাম। সুবহানাল্লাহ! নারীদের ঘরোয়া তালীম ও তারবিয়াতে নিয়োজিত, সংসার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের একজন আল্লাহওয়ালী নারী কত আবেগ ও দরদ নিয়ে, কত সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় মেয়েদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করছেন! বিবাহপূর্ব জীবন, বিবাহপরবর্তী জীবন, সন্তান প্রতিপালন, মেহমানদের ইকরাম ও আপ্যায়ন, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর, সামাজিক আচার-আচরণ, দুআ ও মুনাজাত এবং পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে কত গভীর বোধ, উপলব্ধি ও শিক্ষা তুলে ধরেছেন! আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকাম নসীব করুন। আমাদের ঘরে ঘরে এমন দ্বীনদার, ইবাদতগুযার ও আল্লাহওয়ালী নারীদের জন্ম দান করুন। আমীন।

কিতাবটি পড়া শেষ হলে আমি আমার আহলিয়াকে বললাম, ‘এখন থেকে আত্মীয়-পরিবারে যে মেয়েরেই বিয়ের কথা শুনবে তাকে এই বই হাদিয়া দিবে।’ বাস্তবেই নব বিবাহিত এবং বিবাহযোগ্য বালেগা প্রত্যেক নারীর জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিতাবটির উর্দূ নাম সরাসরি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ‘উত্তম আচার-আচরণ’ বা ‘সুন্দর ব্যবহার’। তবে এই আচার-ব্যবহারগুলো যে পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেকথা বুঝানোর জন্য আমরা বাংলা নাম দিয়েছি ‘আদর্শ দ্বীনী পরিবার: আদব ও শিষ্টাচার’। অর্থাৎ আচার-ব্যবহারের এই শিষ্টতা ও ভদ্রতার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের কথাটা স্পষ্ট করেছি। তাছাড়া এই সকল আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করতে পারলে যে সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠবে, সেটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায়। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। [নয়]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ছোট বড় সকল আমলকে কবুল করুন। আমাদের প্রতিটি পরিবারকে আদর্শ দ্বীনী পরিবার হিসাবে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠক!

মূল্যবান এই কিতাবটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, আমাদেরকে অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

তারিখ: ১৭ রজব ১৪৪২ হিজরী / ০২ মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দারুত তাসনীফ-মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে আজ মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুহতারামা আম্মাজান সায়্যিদা খাইরুন নিসা বেহতর রহ. কর্তৃক রচিত পারিবারিক জীবনের আদব ও শিষ্টাচার বিষয়ক কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কাজটি শুরু হয়েছিল গত রমযানের শেষ দশকে। করোনার বন্দি জীবনে গ্রামীণ পরিবেশের সুন্দর একটি মসজিদে। এরপর অল্প অল্প করে দীর্ঘ দশ মাসে এই পর্যন্ত এসেছে। এখন অনুবাদ শেষে তিনটি প্রুফ দেখার পর ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছে। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, ওয়ালাকাশ শুকরু কুল্লুহ।

কাজটি যখন শুরু হয় তখন ভেবেছিলাম, রমযানের শেষ দশকেই সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। এরপর রমযান গিয়েছে। শাওয়াল গিয়েছে। একের পর এক অনেকগুলো মাস গিয়ে এখন চলছে রজব! এটাকেই বলে তাকদীরের ফায়সালা এবং জীবনের বাস্তবতা! জীবনের পদে পদে এ ধরনের অনেক বাস্তবতা আমাকে সজাগ করে। বারবার সতর্ক করে। তবু যেন ঘুমের ঘোরেই অচেতন হয়ে থাকি!

নিঃসন্দেহে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান। জীবনের প্রতিটি স্বপ্ন তাঁরই অপার অনুগ্রহ। প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভাবনা, প্রতিটি কল্পনা, প্রতিটি অনুভব ও উপলব্ধি তাঁরই দয়া ও মেহেরবানী। তাঁর দেওয়া তাওফীকেই জীবনের সবকিছু পরিচালিত হয়। তাঁর মেহেরবানীতেই সবকিছু সচল থাকে।

কিন্তু সেই তাওফীক ও মেহেরবানী লাভ করার পর যেই পরিমাণ শোকর আদায় করা উচিত, সেই পরিমাণ শোকর কি আমি আদায় করি? অন্তত যথাসাধ্য চেষ্টা কি করি?

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার শোকরগুযার বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। সব ধরনের নাফরমানী থেকে আমাকে হেফাযত করুন। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের খেদমতে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখুন। ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে কাজ করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মুহতারাম মাওলানা সায়ীদুল হক ভাইয়ের সাথে ঢাকার বায়তুল মুকাররাম মসজিদ সংলগ্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাকতাবায় গিয়েছিলাম। সেদিন সময় ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, কাজ ছিল দীর্ঘ। এরই মধ্যে একটি কিতাব মাওলানা সায়ীদ ভাইয়ের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। তিনি আমাকে বললেন, চমৎকার একটি কিতাব! ধরুন তো কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলে নিই। এরপর খুব আগ্রহ নিয়ে কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠার ছবি তুললেন!

এই ঘটনার অনেকদিন পর হঠাৎ একদিন বললেন, 'আপনি এই কিতাবটির অনুবাদ করে দিন না! এতে পারিবারিক জীবনের অনেকগুলো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। ইনশাআল্লাহ খুব ফায়দা হবে।' আমি সম্মত হলাম এবং মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে বিষয়টি জানালাম। তিনি অত্যন্ত খুশির সাথে কাজটি করতে বললেন। জাযাহুমাল্লাহু আহসানাল জাযা।

কিতাবটির রচয়িতা হিন্দুস্তানের বরেণ্য একটি ইলমী খান্দানে বেড়ে ওঠা এক মহীয়সী নারী। পরবর্তীতে যিনি মুআররিখে হিন্দ সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী রহ. সহধর্মিনী এবং মুফাক্কিরে

ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মা। যিনি দীর্ঘ জীবন ঘরোয়া পরিবেশে নারীদের তালীম তারবিয়াতের খেদমত করেছেন। খান্দান ও খান্দানের বাইরের অসংখ্য নারী যার কাছে দ্বীন ও দ্বীনী তালীম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সংসার ও পরিবার বিষয়ে অভিজ্ঞ এই নারী অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে কিতাবটি লিখেছেন। তাতে সংসার জীবনের ছোট্ট থেকে ছোট্ট অনেক বিষয় অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি তার যুগের সমাজ ও পরিবেশকে সামনে রেখে লিখেছেন। তবে বর্তমান সমাজেও তা প্রায় শতভাগ পালন করার মতো। অথচ এই সব বিষয়ে এখন আর তেমন কোনো আলোচনাই হয় না বলা যায়!

ছোট ছোট নয়টি অধ্যায়ে তিনি পারিবারিক জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়টি হলো সন্তান লালন পালন। পঞ্চম অধ্যায় বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও প্রাথমিক চিকিৎসা। এই অধ্যায়ে তিনি তার সময়ের অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে বিভিন্ন গাছ ও গাছের শেকড়াদি থেকে ওষুধ তৈরির পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা তো আগের মতো থাকেনি। গ্রামের মানুষও এখন আর সেই ধরনের ওষুধে অভ্যস্ত নয়। সেইসব ওষুধ তৈরি করাও এখন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জাতীয় কিছু বিষয় চিন্তা করে কিতাবটির সেই অধ্যায় আমরা অনুবাদ করিনি। তবে সেখানের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক কথাগুলো আলাদা শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কিতাব থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের প্রতিটি পরিবারকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী পরিবার হিসাবে কবুল করুন। পরিবারের প্রত্যেকের জীবনকেই সুখ ও স্বচ্ছন্দময় করুন। আমাদের খান্দানগুলোতে তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দী ও আউলিয়ায়ে কেরামের জন্ম দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব
১৮ রজব ১৪৪২ হিজরী / ০৩ মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

ভূমিকা

(হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মুহতারামা আম্মাজান রহ.-এর কিতাব 'হুসনে মুআশারাহ' এর দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, এবং তাতে ভূমিকাস্বরূপ আমিও দুয়েকটি কথা লেখার সুযোগ পাচ্ছি। সন্তানের জন্য মা বাবার যে কোনো খেদমতই সৌভাগ্যের। তবে যে কাজের প্রতি তাঁদের বেশি আগ্রহ এবং হৃদয়ের টান, সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের। তাতে মা বাবার সন্তুষ্টি লাভ করা যেমন সহজ, তেমনি আল্লাহ তাআলার কাছে সেটি কবুল হওয়ার আশাও অনেক বেশি।

ছোটবেলা দেখেছি, মেয়েদের তালীম-তারবিয়াত ও দ্বীনী উন্নতির জন্য আম্মা কত মেহনত করেছেন! তাদের ইলমী ও আখলাকী উন্নতির জন্য কত ফিকির করেছেন! তিনি তাদেরকে অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে পড়াতেন। পরম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তারবিয়াত করতেন।

লেখালেখির প্রতিও আম্মার অনেক আগ্রহ দেখেছি। এর জন্যও তিনি অনেক মেহনত করেছেন। আবেগ ও জযবার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। নিজের লেখাগুলো তাঁর খুবই আদরের ছিল। খুবই আপন ও প্রিয় ছিল। আর 'হুসনে মুআশারাহ' কিতাবটি ছিল তাঁর একান্ত কাছের।

গভীর মমতা ও ভালোবাসা নিয়ে তিনি এটি রচনা করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা কাজটিকে খুব কবুল করেছেন। এর মাধ্যমে খান্দান ও খান্দানের বাইরের মহিলাদেরকেও অনেক ফায়দা দান করেছেন।

যে সময় তিনি কিতাবটি লিখেছেন সে সময় এটি ছাপানোর কোনো ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। খান্দানের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবায়ে ইসলাম'ও ছিল না, যারা তাঁর কিতাবগুলো এখনো বরকতের উসিলা মনে করে ছাপে। অন্য প্রকাশনীগুলোও ছিল না, যারা আমাদের কিতাবগুলো এখন আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে প্রকাশ করে। সেজন্য একথা কল্পনাও করা যায়নি যে, এক সময় কিতাবটির দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হবে!

হিন্দুস্তানে মুসলিম নারীদের জন্য ভালো ভালো কিতাব লেখার মানুষ আগেও ছিল, এখনো আছে। তাদের জন্য চমৎকার চমৎকার কিতাব অনেক আগেও লেখা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু মুহতারামা আম্মাজান রহ. যা কিছু লিখেছেন অত্যন্ত দরদ নিয়ে লিখেছেন। আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে লিখেছেন। এবং একান্তই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে লিখেছেন।

সে সময় তাঁর লেখা সম্পাদনা তো দূরের কথা, তাঁকে পরামর্শ দেওয়ার মানুষও ছিল না। সামান্য সহযোগিতা করার মতোও কেউ ছিল না। তাছাড়া তিনি এমন এক খান্দানে বেড়ে উঠেছেন, যার বিশেষ আদর্শ ও ঐতিহ্য ছিল। সেখানে পুরুষদের মধ্যে বড় বড় লেখক তৈরি হয়েছেন ঠিকই। তারা উর্দূ, ফারসী এবং আরবী ভাষায়ও অনেক লিখেছেন। তাদের কেউ কেউ হিন্দুস্তানের সীমানা পেরিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে, বরং জ্ঞান-বিদ্যার দূর দূরান্তের

নগরীতেও সুখ্যাতি লাভ করেছেন। তবে নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম লেখিকা। প্রথম রচনাকার। সেই যামানায় রচনা লেখালেখি তো অনেক বড় কথা। ছোট কোনো প্রবন্ধ লেখাও ছিল দুরন্ত সাহসিকতা, বরং দুঃসাহসিকতা। লেখালেখি ছিল উচ্চ যোগ্যতা ও চূড়ান্ত দক্ষতার বিষয়।

ঠিক সেই সময় আল্লাহ তাআলা যার মাধ্যমে কাজ নিলেন এবং যাঁকে জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করলেন, তাঁর কলম থেকে আশ্চর্য তিনটি কিতাব প্রকাশিত হলো। ‘হুসনে মুআশারাহ’ ও ‘যা-ইকাহ’ নামে দুটি গদ্য কিতাব, আর হামদ-নাত ও মুনাজাতের একটি পদ্য সংকলন। নাম ‘বাবে রহমত’। এরপর তিনটি কিতাবই এত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল যে, বারবার সেগুলোর মুদ্রণ ও সংস্করণ চলতেই থাকল। আলহামদুলিল্লাহ এখনো সেই ধারা অব্যাহত আছে।

মৌলভী সায়্যিদ মুহাম্মাদ হামযা হাসানী নদভীর বড় সৌভাগ্য যে, সে খান্দানের মুরুব্বীদের কিতাবগুলো পুনঃপ্রকাশ করছে এবং উৎকৃষ্ট মানের ছাপা ও মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে সে আমার বড় বোন মরহুমা আমাতুল্লাহ তাসনীম সাহেবার ব্যাপক সমাদৃত কিতাব ‘যাদে সফর’ খুব চমৎকার আকারে ছেপেছে। এবার খান্দানের অভিভাবিকা এবং বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব, যাঁর দুআর ফল আমরা সবাই ভোগ করছি, আমার মুহতারামা আম্মাজান সায়্যিদা খাইরুন নিসা সাহেবার কিতাব ‘হুসনে মুআশারাহ’কে অফসেট কাগজে ছাপার উদ্যোগ নিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণী উদ্যোগগুলোকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে মুসলিম সমাজ ও তাদের পারিবারিক জীবনে উন্নতি লাভের উসিলা বানান। সকল শ্রেণির নারীদের জীবন গড়ার মাধ্যম হিসাবে কবুল করুন। এর মাধ্যমে আমাদের বিপর্যস্ত সমাজকে উত্তম আখলাকের সবক দান করুন, যে আখলাক তথাকথিত আধুনিকতার সয়লাবে খুব দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি তা আধুনিকতার গতির সাথে পাল্লা দিয়ে নিঃশেষ হতে চলছে। সমাজের পর সমাজ, শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ এখন এই আখলাক থেকে মাহরূম হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আপন মেহেরবানীতে এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এর বার্তাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আবুল হাসান আলী নদভী
৮ যিলকদ ১৩৯৯ হিজরী

লেখিকার কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ آتِنِي بِفَضْلِكَ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

অনেকদিন আগে থেকেই এমন একটি কিতাব লেখার স্বপ্ন ছিল যা পড়তেও ভালো লাগবে, উপদেশমূলকও হবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখনো পূরণ হয়নি। আসলে দুনিয়াবী জীবনের ব্যস্ততা আমাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, কাজটি করার সুযোগই পাইনি! এখন যেহেতু বার্ধক্যের কারণে কিছুটা অবসর হয়েছি, ভাবছি বেকার সময় কাটিয়ে কী লাভ! কিছু না কিছু তো করা দরকার!

কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম, যদি আগের মতোই মেয়েদের তালীম তারবিয়াতের কাজ করি তাহলে খুবই ভালো হয়। কিন্তু সেই হিম্মত ও শক্তি এখন কোথায় পাব? তাছাড়া মন মানসিকতাও আগের মতো নেই। দিল দেমাগও আগের মতো সক্রিয় নয়। তাহলে কি এই চাপ সহ্য করতে পারব?

দেখলাম, এজাতীয় ভাবনাগুলো আমাকে আরও বেশি দুর্বল করে দিচ্ছে। আবার কাজহীন বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। কিছু সময় যদি মেয়েদের সঙ্গে থাকি কিংবা ঘরের কোনো কাজে মন লাগাতে পারি, সেটাও ভালো। আমার দ্বারা যদি কারো কোনো ফায়দাই না হয়, তাহলে এই চোখ, মুখ, হাত, পা, দিল, দেমাগ— যা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান ও দয়ার প্রকাশ, তা তো অকার্যকর থেকে যাবে! আর সেটা হবে অনেক বড় আফসোসের কথা। অতএব এগুলোকে কাজে লাগানো উচিত।

অবশেষে মনে হলো, দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্নটি বাস্তবায়ন করা যায়। আশা করি সেটা খুব ভালো কাজ হবে এবং উত্তম ব্যস্ততা হবে। এর দ্বারা অনেকেরই অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সেজন্য তো কলমের জোর প্রয়োজন। অথচ এখন না সেই মন মস্তিষ্ক আছে, না সেই মেধা ও যোগ্যতা। এরপরও হিম্মত করলাম এবং কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করে দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। বললাম,

سہارے پر تری امداد کے بیڑا اٹھایا ہے
فلک کا بوجھ اٹھانے پر تلی ہوں ناتواں ہو کر

তোমার সাহায্যের উপর ভরসা করে এই বোঝা কাঁধে নিয়েছি
(হে মালিক) আসমানসম বোঝা নিয়েছি দুর্বল অক্ষম হয়েও।

আল্লাহ তাআলা যেন এই বোঝা হালকা করেন এবং আমার এই স্বপ্নকে বাস্তব করে দেন। এর মাধ্যমে যেন ব্যাপক ফায়দা ও উপকারিতা দান করেন। কিতাবটি যেন মেয়েদের জন্য শিক্ষিকা হতে পারে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয় যেন খুব সহজেই শিখিয়ে দিতে পারে।

এ জাতীয় উদ্দেশ্যে আমি আরেকটি কিতাব[1] [১. কিতাবটি 'যা-ইকা' নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। -হামযা [প্রকাশক, মাকতাবায়ে ইসলাম, লখনৌ]] লিখেছি। তাতে বিভিন্ন ধরনের রান্না ও খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে

আলোচনা করেছি। উদ্দেশ্য ছিল, গৃহবধুরা যেন সংসার পরিচালনার সাথে সাথে খুব সহজেই বিভিন্ন ধরনের রান্না শিখতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যেন অন্য কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। মিতব্যয়িতার সাথেই যেন তারা বিভিন্ন প্রকারের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। পরিবারের অন্য সদস্যরাও যেন তাদের মাধ্যমে সুখ ও শান্তি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমীন।

বিনীত
খাইরুন নিসা

মেয়েদের সঙ্গে কিছু কথা

প্রিয় মেয়েরা!

যে ঘরে তোমরা এখন আরাম আয়েশের সাথে জীবন কাটাচ্ছ এবং পরবর্তীতে যে ঘরে তোমাদের যেতে হবে, চলো উভয় ঘরের পূর্ণ নকশা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। যদি ন্যূনতম হুঁশ-জ্ঞানও থাকে, খুব দ্রুত বুঝে ফেলবে তোমরা কোথায় আছ এবং তোমাদেরকে কোথায় যেতে হবে। অনুভব করতে পারবে, আজ তোমরা কী করছো আর কাল কী করতে হবে। বুঝতে পারবে—এখন তোমাদের সামনে কী কী বিষয় আছে, পরবর্তীতে কী কী বিষয় আসবে।

আলহামদু লিল্লাহ, আজ তোমরা তোমাদের মা বাবার তত্ত্বাবধানে আছ। এখানে তোমাদের কোনো দুঃখ নেই। কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু আগামীকাল তোমরা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে?

তোমাদের যত দোষ-ত্রুটি আছে যেমন, রাগ, জিদ, খামখেয়ালী, বদ মেযাজী, ঝগরাটেপনা, অলসতা, আরামপ্রিয়তা, স্বার্থপরতা, এসবই তোমাদের মা বাবারা সহ্য করে নেন। গোপন করে রাখেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এইসব দোষ-ত্রুটি কে সহ্য করবে? কে এগুলো গোপন করে রাখবে?

বিষয়টি যদি একটু ভেবে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে— মা বাবার স্নেহ ছায়ায় তোমাদের কীভাবে থাকা উচিত এবং কী করা উচিত। এরপর অন্যত্র গিয়ে কীভাবে থাকা উচিত, কী করা উচিত। বুঝতে পারবে—তোমাদের যিন্দেগী কীভাবে সুখের হবে, স্বচ্ছন্দের হবে। কীভাবে আরামের হবে এবং উপভোগের হবে।

প্রিয় মেয়েরা!

তোমরা যদি সুখ ও আনন্দের জীবন পেতে চাও, শান্তি প্রশান্তির সাথে জীবন কাটাতে চাও তাহলে কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। আমলের নিয়তে শোন। তাতে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জীবন সুন্দর হবে। পেরেশানীমুক্ত হবে। সুখ ও আনন্দের হবে।

প্রথমে তোমাদেরকে মা বাবার কাছে থাকা সম্পর্কে বলব। তা থেকে তোমাদের অনেক অভিজ্ঞতা হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ। এরপর শ্বশুরালয়ের অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি তুলে ধরে সেখানে থাকার পদ্ধতি বলে দিব। যাতে তোমরা জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পার এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পার। যেন এসব না জানার কারণে তোমাদের কষ্টে পড়তে না হয়। সকলেই যেন তোমাদের সুখের কারণ হয়। তোমরাও যেন সবার চক্ষু শীতলকারী হও। তাতে তোমাদের মা বাবাও খুব খুশি হবেন। অন্যরাও তোমাদের আচার-আখলাক ও মন মানসিকতা দেখে সন্তুষ্ট হবে।

বিষয়গুলো আমলে আনতে পারলে স্বামীরাও তোমাদের প্রতি খুশি হবেন এবং হৃদয় দিয়ে তোমাদের ভালোবাসবেন। পুরো খান্দান এবং শ্বশুরালয়ের সকলেই তোমাদের প্রতি স্নেহশীল হবেন। সবাই তোমাদেরকে একান্ত আপন ও কাছের মনে করবেন। তোমাদের প্রশংসা করবেন এবং তোমাদের ব্যক্তিত্বের কদর করবেন ইনশাআল্লাহ।

ঘর গোছানো শেখা

সেজন্য প্রথমে মা বাবার ঘরকে সাধ্যানুযায়ী সুন্দর করার চেষ্টা কর। যদি এখানে ঘর

গোছানো ও ঘর সামলানোর অভ্যাস গড়ে তোল, তাহলে শ্বশুরালয়ে গিয়েও খুব সহজেই তা পারবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, শ্বশুরালয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম তোমাদেরকে যা করতে হবে এবং যে বিষয়ের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে, তা হলো ঘর গোছানো। সেইসঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মেহমানের খাতির যত্ন, ছোটদের আদর-স্নেহ এবং যাবতীয় হাতের কাজ। এসবই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সবচে বেশি জরুরি হলো ঘর গোছানো শেখা। যদি এটা করতে না পার তাহলে যেন তোমরা কিছুই করতে পার না!

এখন তোমাদেরকে এইসব কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার মানুষ আছে। শিখিয়ে দেওয়ার আপনজন আছে। পরবর্তীতে এমন কেউ থাকবে না। এমনকি হয়ত কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। সমবেদনা পোষণকারীও পাবে না। তখন তোমার দায়িত্ব তোমাকেই পালন করতে হবে। তোমার বোঝা তোমাকেই বয়ে নিতে হবে। তাই এখন যদি এসব না শিখে যাও, পরবর্তীতে শেখা আরও কঠিন হবে। এখন এসব কাজ না করতে পারলে পরবর্তীতে করা আরও জটিল হবে। যদি গাফলত, অলসতা ও অবহেলা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সব সময় কেবল লজ্জিত হতে হবে। তখন কিসের সম্মান আর কিসের অন্যদের খুশি সন্তুষ্টি!

গুণ অর্জনের সময়

প্রিয় মেয়েরা!

আমি জানি, তোমরা কখনো না কখনো ঠিক হয়ে যাবে। এখন তোমরা যা করতে পার না, কখনো না কখনো তার সবই পারবে। নিজের সব দোষ-ত্রুটি একসময় জ্ঞান ও গুণে পরিণত হবে। দুনিয়ার নানা সঙ্কট ও মসিবত তোমাদেরকে সংশোধন করে দিবে। কিন্তু সেটা কখন? যখন তোমাদের কল্যাণকামী এবং সুখ কামনাকারী লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন!

সেজন্য আমি চাই এখনই তোমরা সেইসব জ্ঞান, গুণ ও সৌন্দর্য হাসিল করার চেষ্টা কর। যাতে সেই সঙ্কট ও মসিবত তোমাদেরকে ঘিরে ধরতে না পারে।

তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা সবকিছুই পার। কিংবা প্রয়োজনের সময় সবকিছুই পারবে। তাহলে মনে রেখ, এই ধারণা সঠিক নয়। সম্পূর্ণ ভুল। যদিও কখনো কাপড় সেলাই করে থাক, কোনো কাপড় কাটাকুটি করে থাক, কখনো মাটির বাসন-পাতিল বানিয়ে থাক, কিংবা কোনো জামা, টুপি অথবা ব্যাগে ফুল তোলা শিখে থাক— এগুলোই যথেষ্ট নয়।

কোরআন মাজীদ তিলাওয়াত শেখার পর দুয়েকটি কিতাব হাতে নিয়েই তো পড়া সমাপ্ত করেছ। ওই কিতাবগুলোর মাসআলা মাসায়েল, কিতাব রচনার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ে তো কিছুই জানতে চাওনি। তোমরাই বল, শুধু এতটুকু জানা এবং এইটুকু যোগ্যতা কি আসলেই কোনো যোগ্যতা? এখন যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে তাহলে কিতাব দেখতেই থাক। সমাধান খুঁজে পাও না!

তোমাদের উচিত হলো, যে কাজের দিকে মনোনিবেশ করবে— তা যত কঠিনই হোক, সহজ করে ছাড়বে। কোনো কাজ করতে গিয়ে যেন অন্য কারো সাহায্য নিতে না হয়। তোমার জন্য যেন কাজের লোক রাখতে না হয়। কোনো বিষয়েই যেন কারো শরণাপন্ন হতে না হয়। এমনকি পুরুষদের শরণাপন্নও যেন হতে না হয়। এমন দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে কাজ করবে যাতে পুরুষরাও অবাক হয়ে যায়।

বাচ্চাদের সেবা যত্নও উত্তমভাবে করবে। তাদের প্রাথমিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা নিজেই করবে। তাদেরকে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখবে। এমন যেন না হয় যে, এক প্রয়োজনে

শত প্রয়োজনের জিনিস খুইয়ে বসো। সবদিকে খেয়াল রাখবে। মাঝেমধ্যে বাইরের খোঁজ খবরও রাখবে। এই সমস্ত গুণ যদি হাসিল হয়ে যায়, তাহলে ভাঙ্গা ঘরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেলে, আকল-বিবেকই তোমাকে সতর্ক করবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা তোমাকে সংশোধন করে দিবে।

সরল বিনয়ী আচরণ

বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু মনে করবে। কথা বার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে। নিজের কথায় নিজেরও ক্ষতি করবে না, অন্যকেও কষ্ট দিবে না। ঝগড়া বিবাদ থেকে সবসময় দূরে থাকবে। তাহলে সব পরিবেশই তোমার আপন হয়ে যাবে। সব জায়গাই তোমার জন্য নিরাপদ হয়ে থাকবে। শত্রুও তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। কেউ তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারবে না। তোমার সরল বিনয়ী আচরণের ফলে সবাই তোমাকে মহব্বত করবে। তোমার দ্বারা হঠাৎ কোনো অসঙ্গতি প্রকাশ পেলেও সেটাকে অন্যায় মনে হবে না। জ্ঞানীরা যদি নির্বুদ্ধিতার কোনো কাজও করে বসে, মানুষ সেটাকে ভালো কাজই মনে করে। কিন্তু বেকুব যদি কখনো ভালো কোনো কথাও বলে, মানুষ সেটাকে ভালোভাবে নেয় না। নিতে পারে না। বেকুব নিজের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ভালো বিষয়কে মন্দ করে দেয়। বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে ফেলে। অথচ জ্ঞানীরা শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে আনে।

আমি তোমাদেরকে যে নসীহতগুলো করছি সেগুলো মূলত আকল ও বিবেকের সাথে সম্পৃক্ত। হেকমত ও প্রজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত। মনে রাখবে, আকল ও হেকমত এমন জিনিস যার মাধ্যমে দুনিয়া-আখেরাতের বহু কল্যাণ লাভ করা যায়।

আকল ও হেকমত যেমন মৌলিক গুণ, তেমনি আরেকটি মৌলিক গুণ হলো লজ্জাশীলতা। এই গুণ মানুষকে সকল মন্দ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

চলো, এবার বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। [২৯]

পিত্রালয়

মা বাবার খেদমত ও আনুগত্য

মা বাবার খেদমত করতে পারা সন্তানের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাদের খেদমতের গুরুত্ব এবং সওয়াবও অনেক বেশি। প্রত্যেক সন্তানই মা বাবার খেদমত করে উভয় জাহানের কামিয়াবী লাভ করতে পারে। মা বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও সহজ হয়ে যায়।

মেয়েদের জন্য বিয়ের আগেই মা বাবার খেদমতের মোক্ষম সুযোগ। বিয়ের পর তারা আরেক বাড়িতে চলে যায়। তখন চাইলেও খুব বেশি খেদমত করতে পারে না। সন্তানাদি হয়ে গেলে তো ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। তখন খেদমত ও চিন্তা অনেক ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাই মায়ের বাড়িতে থাকাকালেই খুব যত্নের সাথে মা বাবার খেদমত করবে। খেদমতের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করবে। তাদেরকে খুশি করে তাদের তৃপ্ত হৃদয়ের দুআ নিবে।

সংসারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে আরাম দিবে। তাদের দায়িত্ব-বোঝা হালকা

করে কিছু পরিমাণে হলেও সহযোগিতা করবে। এর মাধ্যমে তুমি ভবিষ্যৎ জীবনের অভিজ্ঞতাও লাভ করতে থাকবে।

মা বাবার খেদমতে কখনোই অবহেলা করবে না। তাদের সকল কাজ নিজেই করে দিতে চেষ্টা করবে। কিছুতেই যেন তাদের কষ্ট না হয় খেয়াল রাখবে। তাদের পছন্দসই খাবার তৈরি করবে। সময়মতো খাবার পরিবেশন করবে। তারা যা কিছু বলবেন মন দিয়ে শুনবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। তারা কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে পেরেশান করবে না। নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কোনো পানাহারের অভ্যাস থাকলে তা প্রস্তুত করে নিয়ে যাবে। এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করবে না। যে কোনো বিষয়ে নিজের বুঝ বুদ্ধিকে খুব কাজে লাগাবে।

তাদের কাপড় চোপড়ের ব্যাপারে খেয়াল রাখবে। কাপড় পরিবর্তনের দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে এনে দিবে। পানি, সাবান, তোয়ালে-গামছা সবসময় প্রস্তুত রাখবে। তাদের বসার জায়গা ও বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

তাদের প্রতি কখনো মন খারাপ করবে না। সব সময় তাদের ধারে কাছে থাকবে। তারা কখনো ক্ষুব্ধ হলে প্রতিউত্তর করবে না। তাদের সঙ্গে তর্কে জড়াবে না। তারা তোমার জন্য যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলোর কথা মনে রাখবে। নিজ হাতে কাজ করে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবে।

নিজের কাজ নিজেই করবে। তাদের জন্য রেখে দিবে না। জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, কাগজ, কলম, রং, সুঁই, সুতা ইত্যাদি সবসময় সংগ্রহে রাখবে। এসব জিনিস থাকলে মাঝে মধ্যে নানা ধরনের কাজ করে দিতে পারবে। এতে তাদের অনেক উপকার হবে। তুমিও অনেক দুআ পাবে।

তোমাদের দোষ-গুণ

প্রথমে আমি তোমাদের ওই সকল দোষ ও বদঅভ্যাস সংশোধন করতে চাই যেগুলো মানুষের স্বভাবজাত নয়। বরং মানুষের মাঝে নতুন করে যুক্ত হয়। এসব বিষয়ের প্রতি তোমাদের মা বাবার দৃষ্টি না পড়লেও একসময় এ বিষয়গুলোই বড় আকার ধারণ করে। এই ধরনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে— দুর্ব্যবহার, বেপরোয়া ভাব, অলসতা, স্বেচ্ছাচারিতা, আরামপ্রিয়তা, অভদ্রতা, কৃপণতা ইত্যাদি। এগুলো এমন বিষয়, যে সম্পর্কে এখনো তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। বয়স যত বাড়তে থাকবে, এগুলো তত বাসা বাঁধতে থাকবে। এগুলো তোমাদের মাঝে বাসা বাঁধলে কেউ তোমাদের আপন হবে না। কেউ তোমাদেরকে ভালোবাসবে না।

বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা—এই দুটি গুণ খুব মেহনত করে হলেও অর্জন করবে। কারণ আকল-বুদ্ধি প্রয়োজনের মুহূর্তে সঠিক রাস্তা দেখিয়ে থাকে। আর লজ্জাশীলতা মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। এই দুটি গুণ সর্বক্ষেত্রেই তোমাদেরকে সঙ্গ দিবে এবং সহযোগিতা করবে। এতে কখনো তুমি লাঞ্ছিত হবে না। হেয় প্রতিপন্ন হবে না। কেউ তোমাকে কখনো খারাপ বলতে পারবে না। কোনো মসিবত আপতিত হলে আল্লাহ তাআলার হুকুমে আসান হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সকল বিষয় আকল-বুদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তাআলা যাকে যত বেশি বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করেছেন, সে তত বেশি উত্তমরূপে কাজ-কর্ম আঞ্জাম দেয়। সকল নির্মাণের মজবুতি ও দুর্বলতা আকল-বুদ্ধির কমবেশির উপর নির্ভরশীল।

বড়দের থেকে শেখা

প্রিয় মেয়েরা!

বড়দের কাজকর্মের দিকে গভীরভাবে খেয়াল রাখবে এবং তাদেরকে দেখে দেখে অভিজ্ঞতা হাসিল করবে। তাদের কর্মপদ্ধতি দেখে দেখে বুদ্ধিমত্তা অর্জন করবে। সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণ করবে। তাদের বিবেক-বিবেচনা ও লাজ-লজ্জার বিষয়গুলো উপলব্ধি করবে। তাদের আত্মসম্মান ও স্বচ্ছ মানসিকতাকে বুঝতে চেষ্টা করবে।

এভাবে বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতার গুণে গুণান্বিত হয়ে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করবে। ইজ্জত-সম্মান ও গর্ব-গৌরবের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সামনে ভালো ও মন্দের দৃষ্টান্ত পেশ করা না হবে এবং পূর্বসূরিদের ঘটনা, জীবনাচার ও তালীম তারবিয়াতের পুরো নকশা তুলে ধরা না হবে এবং সেই যুগের নারীদের জীবনধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পারবে না। সেইসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে তৈরি করতে পারবে না যা মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদ। এমনিভাবে নিজের দোষ ত্রুটি শোধরাতেও পারবে না।

তোমরা হয়তো জানোই না, কোন কোন বৈশিষ্ট্য তোমাদের মাঝে নেই? কী কী বিষয় এখনও অর্জন হয়নি। বুনিয়াদতুল্য কোন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে তোমরা এখনও মাহরূম? কেননা তোমরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। তোমাদের মাঝে তালীম তারবিয়াতের প্রভাব এখন পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়নি। এমনকি সেই বিষয়গুলোও এখনো জানা হয়নি, যার দ্বারা তোমাদের মা বাবা খুশি হন এবং নারায হন।

আগেকার দিনে পারিবারিক শিক্ষা কেমন ছিল

আগেকার দিনে সাধারণ নিয়ম ছিল, মুরুব্বী নারীরা বাচ্চাদেরকে ডেকে কাছে বসাতেন। তাদের সাথে মজার মজার কথা বলতেন। নামাযের সূরাগুলো মুখস্থ করাতেন। শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান শিখিয়ে দিতেন। ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত অনুযায়ী আমলে অভ্যস্ত করে তুলতেন।

যখন ফরয ওয়াজিব ও সুন্নত বিষয়ে জ্ঞান হাসিল হয়ে যেত এবং সে অনুযায়ী আমল স্বাভাবিক হয়ে যেত, তখন আচার ব্যবহার ও সভ্যতা ভদ্রতা শিক্ষা দিতেন। তাদের আচার আচরণের প্রতি সবসময় নজর রাখতেন। তাদের চলা বলা খুব পর্যবেক্ষণ করতেন। ফলে ছোটবেলা থেকেই তারা আদর্শবান হয়ে গড়ে উঠত। মন্দ রীতি ও বদ অভ্যাস থেকে বেঁচে যেত। তাদের মাঝে স্বাধীন মনষ্কতা, স্বেচ্ছাচারিতা, লজ্জাহীনতা ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব বাসা বাঁধতেই পারত না। কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন আর বাচ্চারা সেই রকম শিক্ষা দীক্ষা পায় না। তাই এ জাতীয় সব দোষ-ত্রুটি ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে পাওয়া যায়।

সেই যামানার সকল অবস্থা বর্তমান যামানার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়ার মতো ছিল। এরপরও বাচ্চাদের তারবিয়াতের বিষয়ে খুব লক্ষ রাখা হত। তাদের যে কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হতো না। তাদের যাবতীয় বিষয় বড়দের পছন্দমতো হতো।

মায়েরা তাদের মেয়েদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। তাদের আরাম আয়েশের উপর নিজেদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতেন। শৈশব থেকেই তাদেরকে লজ্জা ও লাজুকতায় অভ্যস্ত করে তুলতেন।

তাদের তালীম তারবিয়াতের প্রভাব এত গভীর হতো যে, পরবর্তীতে অন্য কেউ বা অন্য কোনো বিষয় তাদের মাঝে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারত না। তাদের চলা ফেরা ও উঠা বসার জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করা হতো, যেখানে কোনো ধরনের খারাবী পৌঁছতেই পারত না। সেখানে কখনো বেপর্দা হওয়ার সুযোগ হতো না। মহিলারা ছাড়া অন্যকেউ সেদিকে যেতেই পারত না।

মা কিংবা বোনেরা তাদেরকে বিভিন্ন জিনিস শিখিয়ে দিতেন। বিভিন্ন কাজ দেখিয়ে দিতেন। তারা তাদেরকে ভালো বিষয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। মন্দ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতেন। সকল মন্দ কাজের পরিণাম উল্লেখ করে এমনভাবে সতর্ক করতেন যে, বিয়ের পরও তারা ওই ধরনের কাজ করতে পারত না।

পর্দা ও লজ্জাশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ

লজ্জা শরমকে অমূল্য সম্পদ হিসাবে তুলে ধরতেন। নির্লজ্জ হওয়ার পরিণাম এত ভয়ঙ্করভাবে পেশ করতেন যে, তারা কেঁপে উঠত। কাদের সাথে পর্দা করতে হবে এবং কিভাবে পর্দা করতে হবে বুঝিয়ে দিতেন। এর ফলে চাচা মামাদের সামনেও তারা খুব স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারত না। তাছাড়া পুরুষ বাচ্চারাও তাদের ঘরে আসতে পারত না।

আত্মীয় ছেলেদের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ছোটবেলা থেকেই তাদের সাথে পর্দা করায় অভ্যস্ত করে তুলতেন। না মাহরাম ছেলেদের ঘরে আসাটা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না। এমনকি একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও না।

চাচা, মামা, বাবা এবং আপন ভাই ছাড়া অন্যকাউকে তাদের হাতের লেখা দেখাতেন না। লজ্জাশীলতার কঠিন থেকে কঠিন ধাপ খুব সহজে এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে পার করাতেন। তখন থেকেই লাজুকতাপূর্ণ জীবনে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলতেন। এর জন্য বিশেষ কোনো কালক্ষেপণেরও প্রয়োজন হতো না। এমনিভাবে শরীয়তের খেলাফ সকল কাজকর্ম থেকে তাদেরকে বাধা দিতেন।

দ্বীনী ইলমের চর্চা

কোরআন হাদীস ও দ্বীনী কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাবের প্রতি তাদেরকে মনোযোগী হতে দিতেন না। পরিষ্কার বলে দিতেন, এই বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে সময় ব্যয় করা অনর্থক এবং অন্যায়। নামায রোযার প্রতি তাগিদ অব্যাহত রাখতেন। অযীফা আমল ও মাসনূন দুআর প্রতি সবসময় জোর দিতেন। দ্বীনী বিষয়ের প্রয়োজনীয় সকল কিতাব সংগ্রহে রাখতেন। বিভিন্ন বিষয়ে সেগুলো থেকে সহযোগিতা নিতেন। ফলে দ্বীনী শিক্ষা ও দ্বীনী চিন্তার বিপরীত কোনো কাজ করার সুযোগ হতো না।

দ্বীনী ইলমের যথাযথ চর্চা না থাকলে ইবাদত বন্দেগী ও দ্বীনদারী রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব? মহিলারা তো অবশ্যই, পুরুষরাও কেবল প্রয়োজনীয় ইলম শিখতেন এবং সেগুলোর জন্যই মেধা ও শ্রম ব্যয় করতেন। এরপর চেষ্টা মেহনতে কামিয়াব হলে অত্যন্ত আরামে নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করতেন। কোনো বিষয়ের চিন্তা পেরেশানী থাকত না।

বাস্তবতা হলো, সন্তানরাও সেসময় মা বাবার অনুগত হতো। তাদের কথা শুনতো। এসবই ছিল তাদের তালীম তারবিয়াতের প্রভাব। কিংবা বলতে পারো, তা ছিলো তাদের নেক আমলের নগদ ফল।

বর্তমান যুগের পিতামাতা: উদাসীনতা ও পরিণাম

বর্তমানে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, খোদ মা বাবা সন্তানদের অনুগত! মা বাবাকে সন্তানদের মান অভিমান রক্ষা করতে হয়। তাদের জিদ-খেদকে গুরুত্ব দিতে হয়। এটা মূলত তাদের উপযুক্ত তারবিয়াত না হওয়ার ফল। তালীম তারবিয়াত বিষয়ে নির্লিপ্ত হওয়ার পরিণাম।

যে মা বাবা সন্তানদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকবে, নিজেরা তাদের অনুগত হবে, সন্তানদের হাতে কর্তৃত্ব দিবে, তাদের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, সর্বক্ষেত্রেই তাদেরকে ইচ্ছাধিকার দিবে, তাদের সন্তুষ্টিকে নিজেদের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিবে, তাদের সামান্য মনোকষ্ট মেনে নিবে না, ভালো মন্দও তাদেরকে বুঝাতে যাবে না, তাদের সন্তান কীভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে? কীভাবে তাদের অনুগত হবে? এসবের পরিণাম তো এমনই হওয়ার কথা যেমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

এখন মেয়েরা স্বাধীনমনা, বেপরোয়া এবং নির্ভয় হয়ে যাচ্ছে। যা ইচ্ছা তাই করছে। তারা মা বাবাকে যেমন তোয়াক্কা করছে না, আল্লাহ তাআলাকেও ভয় করছে না। তাদের মাঝে দুনিয়াবী লাজ লজ্জাও নেই। সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বও নেই। আত্মমর্যাদা তো নেই-ই।

তারা জানেও না কোথায় লজ্জা শরম প্রকাশ করতে হয় এবং কোথায় নারীস্বভাবের গুরুত্ব দিতে হয়। সম্মান ও ব্যক্তিত্ব অর্জনের পথ তারা ভুলেই গেছে। লজ্জা শরমের পথ থেকে তারা একেবারে সরে গেছে। এখন তো এমন হয়ে গেছে যে, মনেই থাকে না— আমরা কোন পথ ধরে এসেছি আর কোনদিকে যাচ্ছি।

নেককারদের সান্নিধ্য সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই। কেবলই ঘুরাফেরার প্রতি তাদের আগ্রহ। ভ্রমণ বিনোদনের জন্য তারা উৎসর্গিত প্রাণ। গল্প উপন্যাসের জন্য পাগল। কিচ্ছা কাহিনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ। কোরআন হাদীসের প্রতি অনীহা। করণীয় বিষয় থেকে তারা গাফেল। নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আগ্রহী। মিথ্যা বলা, অন্যের দোষ খোঁজা, ঘনিষ্টদেরকে শত্রু মনে করা, শত্রুদের প্রতি টান অনুভব করা, চড়া মেযাজে কথা বলা, অন্যায় প্রয়োজনে তোষামুদি করা ইত্যাদি তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তারা যেখানে যা দেখে ভালো লেগে যায় যে পথে ইচ্ছা চলতে শুরু করে। শরীয়তের বিষয়ে গুরুত্ব নেই। আদব কায়দার খেয়াল নেই। ইসলামী চেতনাবোধ বলতে কিছুই নেই। পরিণাম বিষয়ে কোনো খবর নেই। ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগ নেই। ভালো মন্দের বাছবিচার নেই। আপন-পরের মাঝে পার্থক্য নেই।

তাদের মধ্য থেকে ভালো মন্দ, সম্মান অসম্মান, সৎ অসৎ, মালিক শ্রমিক, ধনী গরিব, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, সুদিন দুর্দিন, লজ্জা অলজ্জা, বিজ্ঞতা অজ্ঞতা, আলো আঁধার, দূরদর্শিতা দৃষ্টিহীনতা, সওয়াব ও গোনাহ সবকিছুর পার্থক্যরেখা যেন মুছে যাচ্ছে!

পর্দার পথে চলো, লজ্জাশীলতা গ্রহণ করো

প্রিয় মেয়েরা!

যুগ ও যামানা যেমনই হোক। কল্যাণ ও সফলতা তোমার চাই-ই চাই। নিজের ক্ষতি তুমি কীভাবে মেনে নিবে? অকল্যাণের পথে তুমি কেনইবা হাঁটবে? দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবী তো তোমার জীবনের লক্ষ্য। আর সেই কামিয়াবী নিহিত রয়েছে দ্বীনের মাঝে। অতএব দ্বীন থেকে তুমি পিছপা হয়ো না। বাহ্যিক আড়ম্বরতা দেখে তুমি ধোঁকা খেয়ো না।

তুমি পর্দার সৌন্দর্য ধারণ কর। লজ্জাশীলতার কল্যাণ আঁকড়ে ধর। সকল ক্ষেত্রে এবং সবার ক্ষেত্রে তুমি তোমার দ্বীনী গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে চলো।

এজন্য খুব সহজ ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তোমাকে বলে দিচ্ছি। কথাগুলো খুব খেয়াল করে শোনো:

বুঝের বয়স থেকেই তুমি তোমার আত্মীয় ভাইদের সামনেও এমনভাবে আসবে, যেন বুঝা যায় তুমি পর্দা করছ। কখনো তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না। নিজের হাতে তৈরি কোনো জিনিস তাদেরকে দেখাবে না। তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করবে না। তারা আগ বেড়ে কিছু বললে তুমি উত্তর দিতে যাবে না। বরং তুমি যে এটা অপছন্দ করছ এমন ভাব প্রকাশ করবে। এতে বাহ্যিক দূরত্বটা স্পষ্ট হবে।

খেয়াল রাখবে যেন কেউ তোমার নাম ধরে উচ্চস্বরে না ডাকে। এতে বাইরের লোকেরা খুব সহজেই এবং সবার অজ্ঞাতসারেই তোমার নাম জেনে যাবে। কাউকে ডেকে এনে ঘরে বসাবে না। তার কণ্ঠ শুনতে যাবে না। এভাবে প্রতিটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

কাপড় চোপড় ও সাজসজ্জা এমনভাবে করবে যেন তোমাকে পরিপাটি দেখা যায়। বুড়ি হয়ে থাকতে হবে না। নিজেকে অগোছালো করে রাখবে না। চোখে চোখ রেখে কথা বলার অভ্যাস করবে না। কারো কথার মাঝে কথা বলতে শুরু করবে না।

পান তামাক খাওয়ার অভ্যাস করবে না। পান খেয়ে মুখ লাল করে রাখা মেয়েদের জন্য খুবই অসুন্দর বিষয়।

লজ্জাশীলতার সাথে উঠা বসা করবে। মাথার কাপড় ফেলে রাখবে না। হাঁটা চলার সময় এদিক ওদিক ফিরে দেখবে না। খোলা স্থানে বসে থাকবে না। ঘুরাঘুরি থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকবে।

মানুষের বদনাম করবে না। বদনাম হওয়ার মতো বিষয় থেকেও বেঁচে থাকবে। মনে রাখবে, মন্দ কথা খুব দ্রুত প্রচার প্রসার লাভ করে। সেজন্য খুব সতর্ক হয়ে থাকবে। ছেলেদের সাথে বিলকুল উঠা বসা করবে না।

নভেল উপন্যাস

নভেল উপন্যাস পড়বে না। এ জাতীয় বই ঘরেই রাখবে না। অন্যকেও আনতে দিবে না। এখনকার মেয়েরা নভেল উপন্যাসের প্রতি খুব বেশি আসক্ত থাকে। ঘরে কখনো এ জাতীয় বই না থাকলে যেন তারা ক্ষুধার্ত থাকে, যেন দুর্ভিক্ষের মধ্যে থাকে! আল্লাহর ওয়াস্তে এসব পড়া থেকে বিরত থাক। এসব পড়ে হৃদয়াত্মাকে নোংরা করো না। আত্মমর্যাদাবোধ খুইয়ে ফেলো না। চিন্তা কল্পনাকে নষ্ট করো না। ইজ্জত আব্রু ও আত্মসম্মান বজায় রাখ। স্বভাবজাত এই গুণগুলোকে হেফাযত কর। অমূল্য এইসব গুণকে কদর কর। মনে রাখবে, এসব গুণ একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে পুনরায় অর্জন করা কঠিন।

গজল ও সঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস করো না। এসব তোমাদের জন্য শোভনীয় নয়। যদি সুর করে কিছু গাইতেই চাও, দুআ মুনাজাতের বাক্যগুলোই যথেষ্ট। গজল সঙ্গীতে কখনো এমন এমন বাক্য থাকে যেগুলো তোমাদের শোনাও উচিত নয়, নিজে গাওয়া তো অনেক দূরের বিষয়। আগের যামানায় গজল গায়িকাদেরকে মানুষ নিজেদের ঘরে আসতেই দিত না!

প্রিয় মেয়েরা!

ভেবে দেখো, যামানা কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেবল দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ায় সবকিছু কেমন বদলে গেছে। এখন আর আগের অবস্থাও নেই, সেই সৌন্দর্যও নেই, দৌলতও নেই, বরকতও নেই। কোনো জিনিসে এখন আর সেই স্বাদ নেই।

মানুষের কথা বার্তায় সেই নূর নেই, অন্তরঙ্গতা নেই। কাপড় চোপড়ে শালীনতা নেই, সৌন্দর্য নেই। বাচ্চাদের মাঝে শিশুসুলভ সরলতা নেই, ভদ্রতা নেই। বয়স্কদের মাঝে গাম্ভীর্য নেই, পাণ্ডিত্য নেই। মোটকথা এখনকার পৃথিবী সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমান জগৎ সম্পূর্ণ অন্য জগৎ!

এখন লজ্জা লাজুকতার বদলে নির্লজ্জতা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে পঁচা দুর্গন্ধময় নগ্ন/অশালীন ছবিওয়ালা পত্র পত্রিকা ঢুকে গেছে, যার মাধ্যমে মন মেযাজ ও রুচি প্রকৃতিতে বিরাট পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। নির্লজ্জতার পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। চারিত্রিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হতে চলেছে। দ্বীনদারী ও ইসলামী আদাব অনুসরণের পরিবর্তে দুনিয়াদারী মেযাজ তৈরি হচ্ছে। নিষ্পাপ নির্মল আনন্দের পরিবর্তে মন্দ বিষয়ের চর্চা হচ্ছে। ফলে আত্মিক শান্তির পরিবর্তে দুশ্চিন্তা পেরেশানী বেড়ে গেছে।

যেসব সচ্ছল পরিবার আগে বছরের পর বছর মেহমানদেরকে খাওয়াত, সেরকম বহু ভালো ভালো পরিবার এখন নিজেদেরকে নিয়েই পেরেশান। এখন যেন সেই দিনগুলোও নেই, সেই রাতগুলোও নেই। সেই আকার আকৃতিও নেই, সেই অভ্যাস চরিত্রও নেই। সেই হৃদয় মনও নেই, সেই হিম্মত সাহসও নেই। হৃদয় প্রশান্ত হওয়ার উপকরণও নেই, প্রশান্তিও নেই। এখন তো কেউ স্বপ্ন দেখলেও কেবল পেরেশানীর স্বপ্ন দেখে!

মোটকথা এখন সর্বত্রই কেবল হা-হুতাশ, পেরেশানী, অশান্তি। এসবই মন্দ চর্চা ও মন্দ চিন্তার পরিণাম। কথায় বলে, ‘যেমন রুহ তেমন ফেরেশতা!’

আফসোস! আজ সেই অতীত কেবলই কল্পনা।

তোমরা যদি আমার এই কিতাব মনোযোগ দিয়ে পড় তাহলে বুঝবে যে, লজ্জা শরম কেবল এতটুকুই নয় যে, তুমি পর্দার আড়ালে বসে আছ, ব্যস পর্দা করা হয়ে গেছে। বরং এটাও লজ্জাশীলতার অংশ যে, তুমি কাউকে কোনো ফরমায়েশ করবে না। কারণ, ফরমায়েশ শুনলে আত্মমর্যাদাশীল লোকেরা লজ্জা বোধ করে। অতএব যত কাছের মানুষই হোক না কেন, তাকে ফরমায়েশ করবে না। আত্মমর্যাদা বড় দামী জিনিস।

ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ

তুমি এমনভাবে থাকবে যেন তোমার কারণে কারো কোনো কষ্ট না হয়। সবার কাছে প্রিয় হয়ে থাকার চেষ্টা করবে। ভাই ও ভাবী সবাই যেন তোমার প্রতি খুশি থাকে। ভাতিজা ও ভাতিজি সবাই যেন তোমার জন্য পাগলপারা থাকে। সবাই যেন তোমার আচার আচরণে সন্তুষ্ট থাকে।

এটাও লজ্জাশীলতা বরং আত্মমর্যাদারও বিষয় যে, কোনো অবস্থাতেই নিজেকে মন্দ হালতে রাখবে না। ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করবে। তাদের খাওয়া-দাওয়া ও কাপড়-চোপড়ের খোঁজ রাখবে। তাদের সঙ্গে বিবাদে যাবে না। প্রয়োজন হলে কোমলতার সাথে কাজ নিবে।

পড়ালেখার প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করবে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠিয়ে দিবে। ওযু ইসতিঞ্জার জন্য পানি এনে রাখবে। সামান্য কোনো খাবার প্রস্তুত রাখবে। এসব থেকে ফারেগ হয়ে গেলে খাতা কলম ও কিতাবপত্র দিয়ে পড়তে পাঠিয়ে দিবে। [৪২]

মোটকথা তাদের ক্ষেত্রে কোমলতার সঙ্গে কাজ করবে। সর্বক্ষণ তাদের খেয়াল রাখবে।

ভাই-ভাবীদের সাথে আচরণ

বড় ভাইয়ের সাথে ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করবে। তার মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিবে। সে অনুযায়ীই তুমি তোমার কাজ করবে।

মাঝে মধ্যে নিজ হাতে তার জন্য টুপি, রুমাল ইত্যাদি বানিয়ে দিবে। সে বাড়িতে এলে তার কামরা ঝাড়ু দিয়ে দিবে। বিছানাপত্র বিছিয়ে দিবে।

আপন বোনের সাথে যেমন আচরণ কর ভাবীর সাথেও তেমন আচরণ করবে। তার কোনো কিছুর প্রতি লোভ করবে না। কথায় কথায় রেগে যাবে না। যে কাজই করবে খুশি মনে করবে। সুযোগ হলে তার সাথেই খাওয়া-দাওয়া করবে। নিজের জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে তার মাঝে আর তোমার মাঝে কোনো পার্থক্য করবে না।

উভয়ের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির পরিবেশ তৈরি হতে দিবে না। ঘরের কাজগুলো মিলেমিশে করবে। পরস্পরের মাঝে কোনো বিরোধ রাখবে না। একমন একপ্রাণ হয়ে কাজ করবে। হঠাৎ কখনো মন্দ কিছু ঘটে গেলে সে বিষয়ে মা বাবার কাছে অভিযোগ করবে না। সময় সুযোগমতো তার সাথেই কথা বলে মন সাফ করে নিবে।

সামান্য সামান্য কথায় তার সঙ্গে তর্ক জুড়বে না। অন্যথা শ্বশুরালয়ে থাকা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

বড় বোনের সাথে আদব

বড় বোনের সঙ্গে পূর্ণ আদবের খেয়াল রাখবে। তার সঙ্গকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে। কাজ কর্মে তাকে সাহায্য করবে। দুঃখ আনন্দে তার অংশীদার হবে। [৪৪]

তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি মনে করবে। তার ইচ্ছা পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। সে কোনো কাজের কথা বললে তৎক্ষণাৎ করে দিবে। তার কোনো সিদ্ধান্তে আপত্তি করবে না। নিজেকে তার চেয়ে ভালো মনে করবে না। সে তোমার মতের বিপরীত কোনো কথা বললে সে ব্যাপারে খুব সংযমী হবে।

যে কোনো বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে। তাকে জিজ্ঞাসা করে সব কাজ করবে। সে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকলে তুমি তার বাচ্চাদের খেয়াল রাখবে। তার কাজে তুমি যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

ভালো কিছু রান্না করলে সময় সুযোগ বুঝে তাকে শরিক করবে। কিংবা তার বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিবে।

তার শাশুড়ি ও ননদদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। বোনের পক্ষ হয়ে কখনো তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। এতে হিতে বিপরীত হবে। হয়তো তারা তোমার বোনের উপর তার প্রতিশোধ নিবে। তুমি তো কথা বলেই কেটে পড়বে, পরবর্তী আপদ তোমার বোনের উপর আসবে।

কোনো প্রসঙ্গেই তাদেরকে কটাক্ষমূলক কিছু বলবে না। কারণ এর মন্দ পরিণাম তোমার

পরিবারের দিকেই ফিরবে। তাই তাদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখবে। কোনো রকমের দূরত্ব তৈরি হতে দিবে না। কেননা তুমি তোমার বোনের শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে তারা তোমার বোনের উপর যুলুম করবে। এর পরিণামে যেন তুমিই তোমার বোনের সাথে মন্দ আচরণ করলে। তাই তারা অসৌজন্যমূলক কিছু বললেও তুমি চুপ থাকবে। নীরব ভদ্রতার সাথে তাদের কথা শুনবে। অযথা কোনো উত্তর দিতে যাবে না। বরং আগে থেকেই তুমি সৌজন্য রক্ষা করে কথা বলবে। যেন তারা অস্বাভাবিক হওয়ার সুযোগই না পায়।

মনে রাখবে, এমন পরিস্থিতি তোমার জীবনেও আসবে। তাই খুব চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে।

বোনের জিনিসপত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। তবে তোমার জিনিসপত্র তার জন্য ওয়াকফ করে দিবে। তোমার জিনিস ব্যবহার করতে যেন তার সংকোচ না হয়, তোমারও যেন কষ্টবোধ না হয়।

লোকজনের সামনে তার সাথে কানে কানে কথা বলবে না। এতে বদগুমানী বা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তার কাছ থেকে কোনো জিনিস নিলে কিংবা ধার কর্জ করলে অন্যদের সামনেই নিবে। ধারণাকারীকে কোনো মন্দ ধারণা করতে দিবে না। অর্থ সম্পদের বিষয়েও লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখবে। মোটকথা, সবক্ষেত্রেই বিবেক বুদ্ধিকে খুব কাজে লাগাবে। যাতে লজ্জিত হতে না হয়। [৪৫]

শ্বশুরালয়

কয়েকদিন মেহমান হিসাবে

শ্বশুরালয়ে যাওয়ার পর যে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে আসবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি। সেখানে তোমাদের কিভাবে থাকতে হবে সেকথাও বলে দিচ্ছি। আশা করি কথাগুলো তোমরা খেয়াল করবে এবং উপলব্ধির সাথে স্মরণ রাখবে।

যখন তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, প্রথম কিছুদিন শ্বশুর বাড়িতে মেহমান হিসাবে থাকা হবে। তখন যা মিলবে তাই খাবে। তারা যা পরতে দিবে তাই পরবে। কোনো কিছুতে অনীহা দেখাবে না।

তখন এমন ঘোমটা দিয়ে থাকবে না যে, ঘরের কোনো খোঁজখবরই নেই। ঘরে কে এলো, কে গেলো কিছুই জানা নেই। আবার এমনও করবে না যে, নতুন বউ হিসাবে গিয়েই খুব কাজকর্ম শুরু করলে। শাশুড়ি-ননদদেরকেও পাত্তা দিলে না। বাস্তবেই অনেকে বেশি ভালো সাজতে গিয়ে এই ভুল করে। তাদের পরিণতি হয় এমন যে, তারা সবার দৃষ্টিতে হালকা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে সবাই তাকে অন্যভাবে দেখে। একপেশে করে রাখে। কঠিন সমস্যায় পড়লেও তাকে কেউ সাহায্য করে না। নিজেকেই সবকিছু করতে হয়। অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। অতএব তুমি এমন হয়ো না।

শাশুড়ি ননদের সাথে আচরণ

শ্বশুর শাশুড়িকে মা বাবার মতো মনে করবে। ননদদেরকে মনে করবে বোনের মতো।

নিজে কোনো কাজ করতে চাইলে আগে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। তাদের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করবে।

বাপের বাড়ি থেকে কোনো হাদিয়া এলে শাশুড়ি ননদদের সামনে পেশ করবে। তারা সেগুলোকে যেভাবে রাখে সেভাবেই তুমি সন্তুষ্ট থাকবে। [৪৮]

তুমি তোমার মা বাবার কাছ থেকে যা কিছু আনবে সেগুলোও তাদের কাছে রাখবে। শুধু কাপড় চোপড়ের ব্যাগগুলো (সুটকেস) নিজের কাছে রাখতে পার। সেটাও তাদের সন্তুষ্টি অনুভব করলে। অন্যথা সেগুলোও তাদের তত্ত্বাবধানেই রাখবে। তোমার কাছে যা রাখবে খুব যত্নের সাথে রাখবে।

দৈনিক পরিধানের কাপড় আর অনুষ্ঠানাদিতে পরিধানের কাপড় আলাদা আলাদা রাখবে। মেহমানদের সামনে শাশুড়ি ননদের পছন্দ অনুসারে কাপড় পরবে। নিজের আগ্রহ পছন্দকে প্রাধান্য দিবে না। *(বিঃদ্রঃ এখানে শরিয়তের অনুসারি পোশাকের কথা বোঝানো হচ্ছে, নতুবা শরীয়তের খেলাফ কারো হুকুম মান্যই করা যাবে না--- এডিটর)*

নিজের জিনিসগুলোর প্রতি নিজেই খেয়াল রাখবে। তাদের কাছ থেকে কোনোকিছুর হিসাব নিতে যাবে না। সময় সুযোগমতো তাদের কাছে বলবে। তাদের চাল-চলন ও আচার-উচ্চারণ গভীরভাবে খেয়াল করবে। যাতে পরিবারের রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পার।

ধীরে ধীরে এবং অনেকটা আড়ালে থেকেই ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা খেয়াল করবে। খেয়াল করবে কীভাবে কী রান্না করা হয়। কোন পদ্ধতিতে বণ্টন করা হয়। মেহমানদেরকে কীভাবে সম্মান করা হয়। কীভাবে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। কাজের লোকদেরকে কী দেওয়া হয়, কীভাবে দেওয়া হয়।

খেয়াল করবে, তুমি কোনো একটি কাজ কীভাবে করতে আর তারা কীভাবে করে। আগে থেকেই তুমি কী কী কাজ পার, এখন আরও কী কী পারবে।

বাড়িতে কোনো মেহমান এলে নতুন বউ হলেও তুমি কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করবে। ঘর ঝাড়ু দিবে। বিছানা ঝেড়ে দিবে। যথাস্থানে ওযুর পানি রাখবে। হাত-মুখ ধোয়ার জন্য সাবান রাখবে। মোছার জন্য তোয়ালে রাখবে। পানি পান করার জন্য জগ ভরে রাখবে। গ্লাস ধুয়ে রাখবে। পানের বাটা প্রস্তুত রাখবে।

কোনো বিষয়েই যেন তাদের কষ্ট না হয়। তোমার অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতা যেন প্রকাশ না পায়। কর্তব্য ও কর্ম সম্পর্কে যেন তোমাকে অসচেতন মনে করার সুযোগ না হয়।

শীতকালে চায়ের ব্যবস্থা রাখবে। গরমকালে শরবত। খাবারের দস্তরখানে চাটনী, আচার ও সিরকা রাখবে। এসব না থাকলে তৈরি করার চেষ্টা করবে। দুলহান সেজে শুধু বসে থাকবে না। লজ্জা শরমের স্থান ও ক্ষেত্র বুঝে লজ্জা শরম করবে। মনে রাখবে, সীমাতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

বড়দেরকে সালাম দিবে। তাদের সামনে অত্যন্ত আদবের সাথে বসবে। অপ্রয়োজনীয় লজ্জা প্রকাশ করবে না। এতে অনেক সময় মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তবে যাদের সঙ্গে পর্দা করার বিধান রয়েছে তাদের সঙ্গে খুব গুরুত্বের সাথে পর্দা করবে।

সকল কাজকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে প্রতিদিন অন্তত দুই বেলা শাশুড়ি ননদদের কাছে বসবে। শাশুড়িকে খুব সম্মান করবে। তিনি কোনো কথা বললে আদবের সাথে জবাব দিবে। দৃষ্টি

অবনত করে রাখবে।

তোমার কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে কারো মাধ্যমে কিংবা নিজেই তাদেরকে বলবে। তবে প্রয়োজনের কথা বলেই উঠে যাবে না। আরও কিছু সময় বসে থাকবে। অন্যান্য বিষয়েও কথাবার্তা বলবে। কেউ যেন এমন মনে করতে না পারে যে, শুধু নিজের প্রয়োজন জানাতেই এসেছ। জানানো শেষ হলেই উঠে যাচ্ছ। সেজন্য প্রয়োজন না থাকলেও কিছুক্ষণ বসে থাকবে। এতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে পারবে। তোমার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

মাঝে মধ্যে তাদের কাপড়-চোপড় সেলাই করে দিবে। তাদের পান খাওয়ার অভ্যাস থাকলে পানের বোটা ছিঁড়ে সুপারি, চুন ও মসলা দিয়ে পরিবেশন করবে। এমনিভাবে যেসব জিনিসের প্রতি তাদের আগ্রহ রয়েছে সেগুলো নিজের দায়িত্ব মনে করে ব্যবস্থা করবে। নিজের মায়ের সাথে যেমন আচরণ কর শাশুড়ির সাথে তেমন আচরণই করবে।

ননদদের সাথে মহব্বতপূর্ণ আচার ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি মহব্বত প্রকাশও করবে। খাবার-দাবার এবং যেকোনো ভালো জিনিসে তাদেরকে শরিক করবে। ছোট ননদদেরকে কাছে রেখে তোমার জানা কাজগুলো তাদেরকে শিখিয়ে দিবে। হস্তশিল্প, ঘর গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং আরও যা কিছু তুমি পার সেগুলোও শেখাবে। তাহলে তোমার অনুপস্থিতিতেও ঘরের সব কাজ তোমার পছন্দমতোই হতে থাকবে।

মনে রাখবে, যে কাজ তুমি ভালোভাবে করতে পার সেটা নিয়মিতই তুমি করবে। একদিন করার পর আরেকদিন করলে না, এই রীতি সুন্দর না। প্রতিটি কাজ সুচারুভাবে করা উচিত। নিয়ম রক্ষা করে নিয়মিত করা উচিত। [৫০]

শ্বশুরালয়ে অন্যান্যদের সাথে আচরণ

শ্বশুর বাড়িতে ছোট মেয়ে যারা এবং যারা তোমার কাছে আসা যাওয়া করে, তাদেরকে সুযোগ সুবিধামতো বিভিন্ন জিনিস শেখাতে থাকবে। তুমি যা পার এবং যা জান তাই শেখাবে। এসব ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করবে না। তারা যদি পড়াশোনা না করে থাকে, তাদেরকে পড়ানোরও চেষ্টা করবে। মোটকথা, তাদেরকে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে রাখবে। এতে তারাও কিছু না কিছু শিখতে পারবে। তোমারও ভালো লাগবে।

যারা তোমাকে দেখতে আসে, তাদেরকে আপ্যায়নের ফিকির করবে। তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলবে। এমন কিছু করবে না যাতে তারা কষ্ট পায়।

তোমার ভাই ভাতিজিরা এলে খুশি প্রকাশ করবে। তাদের আপ্যায়ন ও খাতির যত্নে ত্রুটি করবে না। তোমার কাছে হাদিয়া দেওয়ার মতো কিছু থাকলে তাদেরকে হাদিয়া দিবে। চলে যাওয়ার আগে নাস্তা করিয়ে দিবে এবং মাঝে মধ্যে আসতে বলবে।

শ্বশুরালয়ে থাকাবস্থায় বাপের বাড়ি থেকে কেউ এলে তার খুব যত্ন করবে। বাপের বাড়ি থাকাকালে শ্বশুর বাড়ির কেউ গেলে তাকেও খুব আপ্যায়ন করবে।

যাদের সঙ্গে উঠাবসা হয় তাদের সঙ্গে সবসময় উত্তম ব্যবহার করবে। মহব্বতপূর্ণ আচরণ করবে। ভালো ভালো কথা বলবে। ছোটদেরকে বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল শেখাবে, যেন ভবিষ্যতে সে অনুযায়ী তারা আমল করতে পারে। সে অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। তারা যদি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় তাহলে খুব আন্তরিক হবে। তোমার হিতকামী হবে। বিভিন্ন কাজে তোমাকে সহযোগিতা করবে। এভাবে তোমার অনেক ধরনের ফায়দা হবে।

তবে তুমি তোমার দায়িত্বের বিষয়ে কোনো অবহেলা করবে না। তাদের পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজের সময় তুমি তোমার কাজ যথাসাধ্য করতে থাকবে।

চাচা, মামা, খালা ও ফুফুদের সাথে আচরণ

চাচা, মামা, খালা ও ফুফুদেরকে খুব সম্মান করবে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বতের সম্পর্ক রাখবে। কাছে ধারে থাকলে সবসময় তাদের খোঁজ নিবে। দূরে থাকলে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করতে যাবে এবং বিনয় ও ভদ্রতার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারা বয়সে তোমার চেয়ে ছোট হলেও নম্রতা ভদ্রতা বজায় রাখবে। তাদেরকে সম্মান করবে। তারা কোনো কিছু বললে খুশিমনে গ্রহণ করবে। তোমার জন্য চাপ হলেও এবং তোমার মনের উপর ভার হলেও তাদের কথা রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

আত্মীয় বোনদেরকেও আপন বোনের মতো মনে করবে। তাদের প্রতি মহব্বত পোষণ করবে। মাঝে মধ্যে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনে খাতির যত্ন করবে। বাড়ি থেকে বিভিন্ন জিনিস মাঝেমধ্যে হাদিয়া পাঠাবে। কোনো অনুষ্ঠান বা দাওয়াতের সময় তাদেরকে সবার আগে দাওয়াত দিবে। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করবে।

খালা ফুফুদের সাথে কখনো বেয়াদবি করবে না। কখনো অসৌজন্যমূলক কোনো কথা বলবে না। মনে করবে, তাদেরকে কিছু বলা মানে নিজের মা বাবাকে বলা।

তাদের সঙ্গে কখনো লেনদেন হলে কিংবা তাদেরকে কখনো ধার-কর্জ দিলে কিছুতেই তাগাদা দিবে না। পরিশোধে বিলম্ব হলে বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে মনে কষ্ট নিবে না। তারা অসচ্ছল-গরিব হলে গোপনে তাদেরকে সাহায্য করবে। এরপর মনে করবে না যে, আমি তার জন্য এটা করেছি, সেটা করেছি!

তারা তাদের সাধ্যের বাইরে কিছু করতে চাইলে তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে সহযোগিতা করবে। সম্ভব হলে নিজেই পুরো কাজটুকু করে দিবে। তবে কখনো এগুলো প্রকাশ করবে না। অন্যদেরকেও বলে বেড়াবে না। কারণ, এতে তারা লজ্জা পাবেন। তবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে তোমার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করবে না।

মেয়েদের মাঝে এখন এসব বিষয়ের গুরুত্ব এবং এইসব গুণবৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে পরবর্তী প্রজন্ম তাদের আত্মীয়দেরকে চিনতেই পারবে না। সন্তানরা যদি তোমাকে আত্মীয়তা রক্ষাকারী হিসাবে দেখে তারাও রক্ষা করবে। এভাবে আত্মীয়তার বন্ধন টিকে থাকবে।

স্বামীর হক

যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে সে গরিব হলেও ধনী মনে করবে। তাকে সম্মান করবে। তার কোনো কথা অমান্য করবে না। তার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ শুরু করবে না। তার সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিবে। সব সময় তাকে আরাম ও শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে।

সে যা দিবে তা-ই খুশিমনে গ্রহণ করবে। তাকে এতটা স্বস্তিতে রাখবে যেন সে তোমার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে। সে যেন তার স্বল্প আয়ের কথা ভেবে মন খারাপ না করে। বরং স্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভব করে। সহযোগী সহকর্মীদের মাঝে মর্যাদা লাভ করে।

তার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের আগে পুরা করবে। যথাসাধ্য তাকে ভালো খাওয়াবে। দারিদ্র্যকালে তার কাপড় চোপড় তুমিই সেলাই করে দিবে। তার যাবতীয় কাজ তুমি নিজে করে দিবে। অন্য কারো দায়িত্বে রাখবে না। নাস্তা ও খাবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্রস্তুত করে রাখবে।

সংকটকালে তাকে পেরেশানীর কথা বলবে না। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু আনতে বলবে না। সেটা আনতে না পারলে তো তারও কষ্ট হবে তোমারও কষ্ট হবে। মনে করবে, তোমার ভাগ্যে সেই জিনিস থাকলে তুমি পেয়েই যাবে। অযথা চেয়ে লাভ কী?

ঘরের সকল কাজ যথাসম্ভব তুমিই করার চেষ্টা করবে। তার দায়িত্বে রাখবে না। কারণ, অনেকের ধৈর্য কম থাকে। এসব কাজের কথা বললে তাদের খুব কষ্ট হয়।

স্বামীর সাথে কেমন আচরণ কাম্য

স্বামী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পেরেশানীমূলক কোনো কথা শোনাবে না। কারণ, জানা নেই সে এখন কোন পেরেশানীতে আছে, কোন কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে। জানা নেই, এজাতীয় কথা শুনে এখন কোন হালত তৈরি হয়ে যায়।

খাওয়ার সময় এমন বিষয়ে কথা বলবে যা শুনে তার মন খুশি হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারে। কারণ, মন ভালো থাকলে ডাল-ভাতও পোলাও কোরমার মতো স্বাদ লাগে। দুশ্চিন্তা পেরেশানীর সময় ভালো ভালো খাবারও বিস্বাদ লাগে। এটা পরীক্ষিত বাস্তবতা।

কোনো কোনো গৃহবধূ স্বামী বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটল কী ঘটছে সব শোনাতে শুরু করে। এতে স্বামীর উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। ফলে সে ক্ষুধা নিয়েই দস্তরখান থেকে উঠে যায়। এতে আল্লাহ তাআলাও নাখোশ হন, তারও মন বিগড়ে থাকে। এমন বেকুবী থেকে আল্লাহ তাআলা সবাইকে হেফাযত করুন।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সামান্য আকল বুদ্ধি দিয়ে থাকলে সেটুকু দিয়েই তুমি তার পেরেশানী দূর করার চেষ্টা করবে। মসিবত থেকে তাকে উদ্ধার করবে। সুচিন্তিত পরামর্শ দিবে। সান্ত্বনা দিবে। প্রশান্তি দিবে। অন্তত সমব্যথী হবে এবং পেরেশানী দূর করার ফিকির করবে।

তিনি ঋণগ্রস্ত হলে হস্তশিল্প বা নিজের অন্য কোনো মেহনতের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তাকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করবে। জমানো টাকা পয়সা থাকলে পেশ করবে। গহনা অলংকার খুলে তার হাতে দিবে। বলবে, এসব আপনার ঋণ পরিশোধের জন্য। তোমার বাবার বাড়ি থেকে দেওয়া গহনা হলেও পেশ করবে। নির্দ্বিধায় গহনা খুলে দিবে এবং পরবর্তীতে কৃপা প্রকাশ করবে না। এমন মনে করবে না যে, আমি সাহায্য না করলে কোনো উপায় ছিল না!

বিবেক বুদ্ধির দাবী

সর্বাবস্থায় নিজেকে স্বামীর খেদমতে পেশ করবে। তার শান্তির জন্য সব ধরনের কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবে। এসব বিষয়ে কোনো অবহেলা করবে না।

তোমার চাওয়া অনুযায়ী জিনিসপত্র না পেলে ধৈর্য ধারণ করবে। তার সাধ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তার কাছে চাইবে। তোমার যদি আকল বুদ্ধি থাকে এবং তোমার ভাগ্য যদি ভালো

থাকে, তাহলে এইসব কুরবানী ও ধৈর্যের মাধ্যমে অনেক কিছু লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

ঘরের সব কাজ তুমি নিজেই করার চেষ্টা করবে। হিসাব করে টাকা পয়সা খরচ করবে। প্রয়োজন অনুপাতে, সুশৃঙ্খলভাবে খরচ করবে। নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই সেলাই করবে। নিজেই খাবার রান্না করবে। বাচ্চাদের দেখাশোনা ও পড়ালেখার বিষয়ে তুমিই চেষ্টা তদবির করবে। এতে যে পরিমাণ অর্থ বাঁচবে তা তো তোমারই সুখের কারণ হবে। তাতে তোমারই আরাম হবে। শান্তি হবে।

অর্থ সম্পদ বেশি থাকলে আমি বলব না—তুমিই সব কষ্ট কর। বরং প্রয়োজন হলে কাজের লোক রাখবে। সম্ভব হলে গৃহ শিক্ষকেরও ব্যবস্থা তখন করতে পারবে।

স্বামী কোনো কথা বললে হাসিমুখে জবাব দিবে। কোনো কারণে সে রাগ হলে তুমি শান্ত থাকবে। সে কোনো কথা বললে মানতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সে তোমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হলে মন খারাপ করবে না। তুমি তার হক যথাযথভাবে আদায় করবে। এতে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি খুশি হবেন। তোমাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।

স্বামীর উপার্জন খেয়াল করে সংসার চালাবে। এরই মধ্যে তার ও বাচ্চাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে। ঘরকে এমন সচ্ছল স্বচ্ছন্দময় করে রাখবে, যেন যে কেউ দেখে খুশি হয়ে যায়।

স্বামী যখন তার সাধ্যানুযায়ী কৃত উপার্জন তোমার হাতে এনে দিবে, তখন খরচের বিষয়টি তোমার উপর ন্যস্ত। যদি সুষ্ঠুভাবে খরচ করতে পার, তাহলে মাটির ঘরকে সোনার ঘর বানিয়ে দিতে পারবে। আর যদি বিবেচনাহীনভাবে খরচ কর তাহলে আবাদ ঘর বরবাদ করে দিবে। মনে রাখবে, বিবেক বিবেচনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তি কখনো পেরেশান হয় না। বিবেকহীনতা আর বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা—এজাতীয় দোষে স্বামীর ও ঘরের সকলের খুব কষ্ট হয়। সব সময় সংকট মসিবত লেগেই থাকে। কখনো নিশ্চিন্তে একবেলা খাওয়ার সুযোগ হয় না। তখন গৃহকর্তা খুব পেরেশান হয়। ক্লান্তমনে ভাবে, সে আর কত করবে!

এভাবে এক সময় সে নিরাশ হয়ে যায়। তার মন ভেঙে যায়। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে ওঠে। ছেলে মেয়েদের জীবনেও যেন আযাব নেমে আসে।

স্বামীকে খুশি করার সহজ তরীকা

বুদ্ধিমতি নারীরা সবসময়ই সুখে থাকে। আরাম ও আনন্দের জীবন যাপন করে। তাদের জীবনের নকশা আমি তোমাকে বলি। শোন, প্রতি মাসে খরচের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে তা থেকে নিয়মিত কিছু অর্থ বাঁচিয়ে রাখবে। কারণ, হঠাৎ কোনো প্রয়োজন হতে পারে। তখন যেন কারো কাছে চাইতে না হয়। স্বামী ও পরিবারের জন্য যেন সেটা পেরেশানীর বিষয় না হয়।

এই কাজ করতে পারলে সবার কাছে তুমি সাদরিত হবে। সবাই তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। তোমার প্রতি স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করবে। তোমার মতামত নিয়েই তারা কাজ করতে চাইবে। স্বামী ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। তোমার অনুগত হবে। তোমাকে মহব্বতের নজরে দেখবে। তোমার পছন্দ-খুশিমতো কাজ করবে।

দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা এমন সৌন্দর্য যার আলো বহুদূর পর্যন্ত ছড়ায়। বহু সুন্দরী নারী অদক্ষতা ও বুদ্ধিহীনতার কারণে অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়। তাদের রূপ ও সৌন্দর্যকে তুচ্ছ মনে হয়। সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা নারীদের চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে আখলাক ও আচরণগত সৌন্দর্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এমনিভাবে যে সকল নারী স্বামীদের অনুগত হয় তাদের স্বামী যত বদ মেযাজীই হোক না কেন, স্বামীকে তারা বশে আনতে পারে। তাদের মন জয় করে পরিবর্তন আনতে পারে। সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এসব তাদের জন্য কঠিন কিছুই নয়।

কিন্তু আফসোস! অনেক স্ত্রীরা মনে করে, তারা যত বেশি কঠোর হবে স্বামীরা তত বেশি তাদের অনুগত হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কঠোরতার কারণে যদি স্বামীরা তাদের মন রক্ষা করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়, সেটা মহব্বতের কারণে নয়। বরং ঝগড়াবিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক থেকে বাঁচার জন্য!

যে স্ত্রীরা মহব্বতের কারণে অথবা লজ্জা শরমের কারণে কিংবা আল্লাহ তাআলার ভয়ে স্বামীর কথা শুনে, স্বামীর খেদমত করে, তারাই পরবর্তীতে স্বামীর প্রিয় হয়ে উঠে। স্বামী তখন তাদের সুখ ও কল্যাণ কামনা করে। তাদের সকল ইচ্ছা পূরণ করতে চায়। তাদের কোনো কষ্ট হতে দেয় না। এভাবে তারা খুব সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে।

এসব মূলত তাদের ভাগ্যেই জুটে, যারা বুদ্ধিমতী। অতএব আল্লাহ তাআলা যাকে আকল বুদ্ধি দান করেছেন, সত্যিই তাকে অনেক কিছু দান করেছেন। আকলহীন লোক বাস্তবেই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। আকল বুদ্ধির অধিকারী লোকেরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে লাভবান হয়ে থাকে। বেওকুফরা কেঁদে কেঁদে জীবন পার করে। স্বামী তো দূরের কথা সন্তানরাও তাদেরকে সঙ্গ দেয় না।

তাই তোমাদের জন্য জরুরি হলো, যদি আকল জ্ঞান না থাকে তাহলে খুব ভেবে চিন্তে কাজ করবে। দীর্ঘদিন এভাবে কাজ করতে থাকলে কিছু না কিছু আকল বুদ্ধি হয়েই যায়। সেইসঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে আকল বুদ্ধি চেয়ে খুব দুআ করবে।

ঘর ও সংসার

ঘরের কাজ ও সাংসারিক জীবন

সংসার করা খুব সহজ বিষয় নয়। অনভিজ্ঞদের জন্য তো বেশ কঠিন। কারণ, সংসার মানে শুধু এটা নয় যে, ঘরে যা কিছু আছে সেগুলো মাচায় উঠিয়ে রাখবে। সিন্দুক থেকে অর্থ বের করে বিভিন্ন জিনিস আনতে দিবে। নানান ধরনের খাবার রান্না করে একের পর এক খাওয়া-দাওয়া করবে। এরপর বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়বে এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে!

সংসার তো এমন বিষয়, যার জন্য অনেক আকল বুদ্ধি দরকার। হিম্মত ও সাহস দরকার। উন্নত আখলাক দরকার। ব্যক্তিত্বের প্রভাব দরকার। যোগ্যতা, দক্ষতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ দরকার। এসব জিনিস না থাকলে সংসার করা কঠিন হয়ে যায়। সাধের জীবনটা মাটি হয়ে যায়।

অনভিজ্ঞ মেয়েরা মনে করে, সংসার করা কঠিন কিছু নয়। তারা বিষয়গুলো আন্দাজই করতে পারে না। আসলেই সংসার জীবন অনেক ঝামেলার। বহুমুখী ব্যস্ততার। এতে ফেঁসে গেলে যেমন মাথা বের করা যায় না, পা ছুটানোও সম্ভব হয় না। এমনকি নিশ্চিন্তে একটু

বসাও কঠিন হয়ে যায়। এজন্য আগের যুগের মহিলারা বলতেন, কাউকে বদদুআ দিতে চাইলে এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'তোমার উপর সাংসারিক ঝামেলা এসে পড়ুক!'

ভারী দুটি দায়িত্ব

মহিলাদের জীবনে বড় বড় দুটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। ভারী ভারী দুটি দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হয়।

১.সংসার পরিচালনা।
২. বাচ্চা লালন পালন।

এই দুটি দায়িত্ব যারা সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে, তারা দুনিয়ার পুলসিরাত পার হয়ে যায়! সাংসারিক জীবনে হাজার রকমের ব্যস্ততা থাকে। তাতে নানান বিষয়ে বদনামও হয়। তবে যেসব স্ত্রীরা স্বাধীনমনা, আরামপ্রিয়, যাদের সুনাম বদনামের কোনো তোয়াক্কা নেই, তাদের কথা ভিন্ন। তারা সর্বাবস্থায়ই খুশি। তাদের স্বামীরা যা কিছু কামাই করে, হাতে এনে দেয়। সেখান থেকে তারা যেভাবে ইচ্ছা খরচ করে। চাহিদামতো খাওয়া-দাওয়া করে। এরপর নিশ্চিন্তে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দুনিয়া এবং দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে তারা কোনো খবর রাখে না। কে খেলো কে খেলো না, কার কী অবস্থা, মা বোনদের কী খবর, আত্মীয় স্বজনদের কী হাল, শাশুড়ি ননদরা কী বলছে, এসব নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। যেভাবেই হোক কেবল দিন পার করা তাদের উদ্দেশ্য। ধিক এমন জীবনের প্রতি, যে জীবন কারও কোনো উপকারে আসে না। এমন ক্ষুদ্রমনা ও উদাসী মহিলাদের পড়শিরাও সাধারণত ভালো হয় না।

প্রিয় মেয়েরা!

কোনো সভ্য মানুষের জন্যেই এজাতীয় অভ্যাস কাম্য নয়। তাদের মাঝে থাকা উচিত কর্মচঞ্চলতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, স্বামীর আনুগত্য, বাচ্চা লালন পালনের যোগ্যতা, আত্মীয় স্বজনদের হক সচেতনতা ও পড়শিদের খোঁজখবর রাখার অভ্যাস। এসবই সৌভাগ্য ও সফলতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সাংসারিক কাজকর্ম

তোমরা যেহেতু সংসার জীবন সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তাই কিছু বিষয় আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা ফিকির কর এবং সে অনুযায়ী আমল কর, তাহলে আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে। তোমাদের উপর কোনো আপত্তি উঠবে না। সবাই তোমাদের প্রতি দরদী হবে। তোমাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। সংসার জীবনে তোমরা সুখী হবে ইনশাআল্লাহ।

শোনো, বউ হয়ে স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই মেয়েদের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। এটা সাধারণ রীতি। আল্লাহ তাআলা তোমাকে আকল জ্ঞান দিয়ে থাকলে খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রতিটি কদম ফেলবে। যখন থেকে তোমার হাতে সংসারের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে, তখন থেকেই নিজেকে অন্যদের অনুগামী মনে করবে। তাদের মান অভিমান রক্ষা করা ও তাদের আনুগত্য করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিবে। আগে যারা তোমার মন রক্ষা করে চলত, এখন তুমি তাদের মন রক্ষা করে চলবে। কারণ তুমিই এখন সবচে বড় দায়িত্বশীল। তাই বলে কোনো কাজ নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক করতে যাবে না। নিজেকে

সিদ্ধান্ত প্রদানকারীও মনে করবে না। অন্যদের চেয়ে নিজের মর্যাদা বেশি মনে করবে না। বরং তাদের সিদ্ধান্ত ও সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিবে।

নিজের প্রয়োজনগুলোর সাথে সময় সুযোগমতো তাদের প্রয়োজন পূরণেরও চেষ্টা করবে। তাদের মন মানসিকতা যদি তোমার মন মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে তাদের খুব সঙ্গ দিবে। যদি তা না হয়, তাহলেও তাদের কোনো হক নষ্ট করবে না। তাদের সাথে কোনো ধরনের বিরোধে যাবে না। যৌথ খাদ্যদ্রব্য থেকে একাকী কিছু খাবে না। সেখান থেকে তাদের অগোছালো কিছু নিবে না।

এসব বিষয় অনেক ক্ষেত্রে নিজে নিজে বুঝা সম্ভব হয় না। অন্যের কাছ থেকেও কিছু বিষয় বুঝে নিতে হয়। তাছাড়া নিজের কাছে নিজেকে তো ভালোই মনে হয়! তাই বলে কী হয়? নিজের বানানো দইকে কি কেউ টক বলে? কথায় বলে,

সোনা জানে গে আদমি জানে বসে
স্বর্ণ চেনা যায় ঘষা দেওয়ার পর। মানুষ চেনা যায় বসবাসের পর।

সবার মন মানসিকতা ও রুচি প্রকৃতি বুঝা সহজ নয়। তবে একথাও সত্য যে, নিজের অবস্থা কেউ লুকিয়ে রাখতে পারে না। তার সঙ্গে উঠা বসা করলে, কথাবার্তা শুনলে, তাকে কাছে থেকে দেখলে ধীরে ধীরে অনেক কিছুই বুঝা যায়।

সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার

যে যেমনই হোক না কেন, তুমি তাদের সাথে ভদ্রতা বজায় রাখবে। যথাসম্ভব তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। তা না হলে তোমার অধৈর্যতা ধরা পড়বে। তোমার বদ অভ্যাস ও মন্দ আচরণ প্রকাশ পাবে। মনে রাখবে, উত্তম আচরণ ও দয়া অনুগ্রহের সামনে সবাই মাথা নত করে। একটু দেরিতে হলেও সবাই তার প্রতি মুগ্ধ হয়। উত্তম আচরণের ফলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়।

অন্যের হক নষ্ট করে ধনী হওয়া যায় না। কৃপণতা করে সম্পদ বাড়ানো যায় না। এসবের পরিণাম হয় উল্টো। এসবের কারণে অন্যায় পথে সম্পদ খরচ হয়। অনর্থ কাজে ব্যয় করতে হয়। একদিক বাঁচাতে গিয়ে দশ দিকের ক্ষতি হয়ে যায়। এটাই বাস্তবতা। জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতাও এমনই।

তোমার কাছে যদি খরচ করার মতো কিছু না থাকে কিংবা প্রয়োজনের সময়ও কিছু করতে না পার, তাহলে সেটা অপারগতা। সেটা স্পষ্টই বুঝা যাবে। অন্যদেরও বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু যদি সাধ্য থাকতেও কিছু না কর কিংবা বৈরিতা প্রকাশ কর, সেটা অবশ্যই তোমার জন্য অমঙ্গল হবে।

আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে সচ্ছলতা দান করেন তাহলে কখনো কার্পণ্য করবে না। সক্ষমতা থাকলে দান অনুদানের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করবে। এমন যেন না হয় যে, শুধু নিজের জন্য আর নিজের বাচ্চাদের জন্যই খরচ করছ। ভালো ভালো কাপড় পরছ। বিভিন্ন ধরনের অলংকার বানাচ্ছ। সবকিছু নিজেই ভোগ করছ। অতিরিক্ত কিছু জমাও রাখছ। অন্যদেরকে কিছুই দিচ্ছ না। এমনকি স্বামীর খরচের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করছ না। এটা ভুল কর্মপন্থা। এটা মন্দ অভ্যাস। এটা সংকীর্ণমনা ও হীন মানসিকতা। এটা বরং নিজের প্রতি যুলুম। এমন লোকদেরকে মানুষ সঙ্গ দেয় না। সবাই তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে।

প্রয়োজন উত্তম গুণ ও অভিজ্ঞতা

হে মেয়েরা!

তোমাদের কাঁধে যখন সংসারের দায়িত্ব আসবে, তখন তোমাদেরকে বলা হবে 'ঘরওয়ালী' বা ঘরের মালিক। তুমি তখন উত্তম গুণাবলীরও মালিক হও। মনে রাখবে, কেবল পয়সা কড়ির মালিকানা এলেই মানুষ মালিক হয় না! উত্তম আখলাক ও উন্নত চরিত্রের মালিক হতে হয়। তাই ঘরের যাবতীয় কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে। প্রতি মাসে এবং পুরো বছরে ঘরে যা কিছু প্রয়োজন হবে সব তোমাকেই পূরণ করতে হবে।

বাড়িতে বিয়ে শাদি কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান এবং এ জাতীয় অনেক আবশ্যকীয় বিষয়াদি থাকবে। তখন একথা বলে দায়িত্ব সারা যাবে না যে, আমার কাছে তো টাকা-পয়সা নেই! কীভাবে কী করব! অনেক মহিলা এমনই বলে। এভাবে দায়িত্ব এড়াতে চায়। এতে বদনাম হয়। অন্যরা তার প্রতি বিরক্ত হয়। সংসার জীবনে সে ব্যর্থ হয়। এরপরও দেখা যায় সে এই অবস্থায়ই আছে। এভাবেই কেবল আফসোস ও হতাশা প্রকাশ করছে।

তুমি যদি সাংসারিক বিষয়গুলো না বুঝ তাহলে বিভিন্নজনের প্রতি ভুল ধারণা তৈরি হবে। কারণ তোমার তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কোন্ জিনিসের প্রয়োজন আছে কোনটার প্রয়োজন নেই, বুঝবে না। কোন্ জিনিসের দাম কত, জানবে না। চাল ডালের বাজার সম্পর্কে ধারণা থাকবে না। কাপড়-চোপড়ে খরচ কেমন, অনুমান করতে পারবে না। আবার নিজে নিজেও এসব সংগ্রহ করতে পারবে না। অথচ দুনিয়ায় চলতে হলে এসব বিষয়ে কিছু না কিছু জানা থাকতেই হয়। নিজে কাজ করা, অন্যকে দিয়ে কাজ করানো, কারও সঙ্গে লেনদেন করা, ন্যায় অন্যায় বুঝা, ঘর মেরামত করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা এবং এ জাতীয় আরও অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এমন আরও অনেক বিষয় সামনে আসে। অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রয়োজনের সময় এগুলো কীভাবে বুঝবে?

প্রতি যখন তোমার অভিজ্ঞতা ও জানাশুনা থাকবে না তখন অন্যের ভুল ধারণা হওয়ার অবকাশ থাকবে। ভুল ধারণা থেকে মন খারাপ হবে। মন খারাপ থেকে দূরত্ব তৈরি হবে। এভাবে সবকিছু এলোমেলো হতে থাকবে। ফলে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমার কিছুই জানা থাকবে না। এতে বড় পেরেশানী হবে।

আমার এই নসীহতগুলো এখন অনর্থ মনে হতে পারে। মনে হতে পারে আমি যা কিছু উপরে বলে এসেছি তুমি কাজ করলে এরচেয়ে ভালো কিছু করতে পারবে। বা এখন তুমি যেভাবে চলছ, যা কিছু করছ, তা উপরের নসীহতগুলোর চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু খেয়াল করে দেখো, এটা তোমার নিছক ধারণা হতে পারে। যে সময় তোমার কাছে দায়িত্ব আসবে এবং প্রয়োজনগুলো সামনে আসবে, তখন আসল বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন দেখবে কিছুই করতে পারছ না। আকল বুদ্ধিও কোনো কাজ করছে না।

সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র

তোমার জানা থাকা উচিত, পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি জিনিস কোনগুলো? কোন্ কোন্ জিনিস প্রতিদিন, কোনগুলো মাসে দুয়েকবার আর কোনগুলো মাঝে মধ্যেই প্রয়োজন হয়? আর কী কী জিনিস সবসময় ঘরে থাকতে হয়?

একথা ঠিক যে, কাজ করতে করতে সব জানা হয়ে যাবে। তবে তা হবে বদনাম হওয়ার পর। দীর্ঘদিন কষ্ট করার পর। এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পর।

অথচ একটু আগে থেকেই বিষয়গুলো বুঝে নিলে তোমার জন্য খুব আরাম হবে। সবার জন্য বেশ আনন্দের হবে। বদনাম থেকেও তুমি বেঁচে যাবে।

তাই সংক্ষেপে জেনে নাও, কোন কোন জিনিস প্রয়োজনীয় আর কোন কোন জিনিস অপ্রয়োজনীয়। কোন কোন জিনিস সবসময় প্রয়োজন আর কোন কোন জিনিস মাঝেমধ্যে প্রয়োজন। সেইসঙ্গে জেনে নাও, সংসারের কোন কাজে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়।

ঘরে অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে দুয়েকটা চৌকি বা খাট অতিরিক্ত থাকা ভালো। চৌকি খাট বেশি না থাকলে খুব পেরেশানী হয়। মেহমান এলে বা হঠাৎ কোনো প্রয়োজন হলে অন্যের ধারস্থ হতে হয়। এতে নিজেকেও লজ্জিত হতে হয়, অন্যরাও বিব্রত হয়।

চৌকি বা খাটগুলো খুব উন্নত মানের হওয়া জরুরি নয়। ব্যবহার উপযোগী হলেই চলবে। সাধারণ বা শানদার—যেমনই হোক। যেন এমন না হয় যে, মেহমানকে মাটিতে শুতে দিতে হয়। কিংবা নিজেদেরকে মাটিতে শুতে হয়। এসব করতে গেলে ভেতরে ভেতরে অপমানবোধ থাকে।

তবে খাট সংগ্রহের আগে জানতে হবে—এতে কী পরিমাণ খরচ হবে। তোমাদের তো উপার্জন অনুপাতে কাজ করতে হবে। এই অনুপাত বিষয়টি সবক্ষেত্রেই খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিস তো আরও আছে। সেসবের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে সম্ভব হলে এ জাতীয় জিনিস প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি হলেই ভালো। খাট তো এমন প্রয়োজনীয়, যা না থাকলে অনেক কষ্ট হয়। এবং একবার সংগ্রহ করে নিলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাজ চলে।

কিছু জিনিস তো এমন যেগুলো দুই তিন বছরে একবার প্রয়োজন পড়ে। আবার কিছু জিনিস এমন যেগুলো সব সময় লাগে। সেগুলো ছাড়া সংসার চলতেই পারে না। এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। সেজন্য বিবেচনাগুণ অর্জন করতে হবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস

ডেগ পাতিল এবং এ জাতীয় যত জিনিস আছে সবই নিত্য প্রয়োজনীয়। এসবের মধ্যে রয়েছে কড়াই, রুটি ছেঁকার তাওয়া, চিমটা, চাকু, কাঁচি, সরতা এবং ছোট বড় চুলা ইত্যাদি। যোগ্যতা থাকলে মাটির চুলা বা পাকা চুলা নিজেই বানিয়ে নিতে পারবে।

কিছু জিনিস এমন যেগুলোর কোনো বিকল্প হয় না। যেমন, চাকু, ছুরি, কাঁচি, সরতা এগুলোর কাজ অন্যকিছু দিয়ে করা যায় না। অন্যকিছু দিয়ে করতে গেলে যথাযথ হয় না। এমনকি জিনিসটাই কখনো নষ্ট হয়ে যায়।

এমনিভাবে দা, বটি, ছোট ও বড় ছিদ্রের চালনি, ছোট বড় টুকরি, কুলা, বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা, ছোট বড় দস্তরখান ইত্যাদিও খুব জরুরি জিনিস। এগুলো সবসময় সংগ্রহে রাখতে হবে।

পাত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ

হাড়ি পাতিল মাটির হোক বা কাঁসার (কিংবা হোক সিলভারের) ছোট বড় সব ধরনেরই থাকা উচিত। থালা বাসনও প্রয়োজন পরিমাণ বরং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি থাকা উচিত। কয়েক ধরনের ডেগ ডেগচি সংগ্রহ করে রাখতে পার। তামা, পিতল, স্টিল ও অন্যান্য ধাতব বস্তুর

পাতিল থাকতে পারে। চার পাঁচ কেজি বা আরও বেশি রান্না করা যায় এমন পাতিলও সংগ্রহে থাকা চাই। সামর্থ্য থাকলে বড় ডেগও কিনে রাখবে।

ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের চামচ রাখতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কাঠের চামচও দরকার হয়। খাবার ঘুটানোর জন্য কাঠের নাড়ানি লাগে। সেইসঙ্গে বড় পেয়ালা কমপক্ষে দুটি রাখবে। এবং বিভিন্ন প্রকারের রুটি ছেঁকার ছোট বড় তাওয়া রাখবে।

প্রত্যেকটা জিনিসের ঢাকনা রাখবে। যাতে ব্যবহার করতে কষ্ট না হয়। জিনিসগুলো ঢাকনা চামচসহ আলাদা রাখবে। সবসময় ব্যবহার করবে না। নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে রাখবে। যেন প্রয়োজনের সময় সহজেই পাওয়া যায়। খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।

যেসব জিনিস সব সময় ব্যবহার করা হয় সেগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। প্রয়োজনের সময় তখন অন্যের কাছে খুঁজতে হয়। তুলে রাখা জিনিস কাজের জন্য বের করবে এবং কাজ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে রাখবে। অলসতা করে ফেলে রাখবে না। প্রতিটি জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্ন ও সতর্কতা কাম্য। থালা বাসন, ছোট বড় ডিশ, চামচ, পিরিচ ইত্যাদি এই পরিমাণে থাকা উচিত যেন বিশ পঁচিশজন মানুষ একসঙ্গে খেতে পারে। সেই আয়োজনের জন্য যেন অন্যের ধারস্থ হতে না হয়।

মাটি ও চীনা মাটির বাসনের সাথে মানুষ তামার বাসনও ব্যবহার করে। এগুলো রাং[2][২. সীসা ও টিনের মিশ্রধাতুবিশেষ, যা দুটি ধাতব বস্তু জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। দ্রষ্টব্য : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা : ১১৭০] দিয়ে প্রলেপ দিয়ে ব্যবহার করতে হয়। নয়তো সপ্তাখানেক পরে তাতে রান্না করাই যায় না। এমনকি প্রলেপ একটু কমে গেলেই খাবার বিস্বাদ হয়ে যায়। তবে তামার জিনিসপত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এবং যখন ইচ্ছা দোকানদারের কাছ থেকে কিছু বিনিময় দিয়ে বদলানোও যায়।

জিনিসপত্রে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে রাখবে। অন্যথায় খুব দ্রুত হারিয়ে যাবে। তখন চিহ্ন ছাড়া সেগুলোকে নিজের দাবি করতে পারবে না। তাই যখনই বাসন কিনবে সঙ্গে সঙ্গে চিহ্ন দিয়ে নিবে।

ডিশ ও বাসনের সাথে ভিন্ন ভিন্ন চামচও রাখবে। চায়ের কাপের সঙ্গেও চামচ পিরিচ পর্যাপ্ত রাখবে। কেতলি, ফ্লাস্ক এগুলো কাছাকাছি রাখবে। সঙ্গে কয়লাও ব্যবস্থা করে রাখবে।

জিনিসপত্র রাখার জায়গা

ঘরের প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় খুব সহজেই সেটা পেয়ে যাবে। এমনকি অন্ধকার ঘর থেকেও কোনো জিনিস বের করে আনতে পারবে। এতে তোমার খুব আরাম হবে। কাজ কর্মে সুবিধা হবে।

নির্দিষ্ট জায়গায় জিনিসপত্র না রাখলে প্রয়োজনের সময় খুব কষ্টে পড়তে হয়। অনেক সময় খুঁজতে খুঁজতেও পেরেশান হতে হয়। তাই প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট জায়গায় রাখার ব্যাপারে যত্নশীল হবে।

অনেক পরিবার ছয় মাস বা এক বছরের চাল, গম একসাথে সংগ্রহ করে। এমন হলে কোথায় এগুলো রাখবে সে ব্যাপারে খুব হিসাব করবে। জিনিসগুলো যেন নষ্ট না হয় কিংবা পোকা-মাকড়ের কবলে না পড়ে, খুব খেয়াল করবে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বড় পাত্র পাওয়া যায়। সেগুলোতে রেখে পাত্রগুলোর মুখ খুব ভালোভাবে বন্ধ

করবে। এরপর মাঝে মধ্যেই খোঁজখবর নিবে যে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না!

অনেকগুলো পাত্রে জিনিস থাকলে একটা একটা করে আগে শেষ করবে। যখন যেটা থেকে সুবিধা হয় সেটা থেকে নিবে না। বরং একটা পাত্র থেকে এক মাসের বা এক সপ্তাহের জিনিস নিয়ে রাখবে। এভাবে এক পাত্র শেষ হলে আরেক পাত্র থেকে নেওয়া শুরু করবে।

চাল, গম ইত্যাদি ছাড়াও অন্যান্য জিনিসপত্র কোন্ পাত্রে কোনটা রেখেছ খেয়াল রাখবে। প্রত্যেকটার গায়ে নাম লিখে রাখলে বেশি ভালো। যেমন, চাল, ডাল, আটা, মসলা [মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরা, লং, দারুচিনি]—এভাবে। এরপর প্রত্যেকটা পাত্র যেন সহজেই বের করা যায়, সেভাবে রাখবে।

পাত্রগুলো রাখার ক্ষেত্রে এটাও খেয়াল রাখবে, যেন একটার সঙ্গে থেকে আরেকটা নষ্ট না হয়। একটার গন্ধ যেন আরেকটার মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। এতে বিশ্রী অবস্থা হয়। কখনো খাবারগুলো বিস্বাদ হয়ে যায়। কখনো নষ্ট হয়। তাই এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকবে।

আরও কিছু বিষয়

প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্রও রাখবে। যেমন ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের মাপযন্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের পাত্র। যেন কারও কাছ থেকে কিছু নিলে কিংবা কাউকে কিছু দিলে মেপে নিতে পার। কারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা উচিত। শরীয়তে এ ব্যাপারে খুব তাগিদ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার পাকড়াও অনেক কঠিন।

সম্ভব হলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ কিনে রাখতে পার। এক সপ্তাহের বা এক মাসের পরিমাণ একসঙ্গেই নিতে পার। এগুলো অল্প অল্প করে আনলে অনেক সময় বরকত পাওয়া যায় না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে রয়েছে লাকড়ি, তেল, ঘি, বিভিন্ন প্রকারের মসলা ও পান সুপারি। এগুলো একদিন না থাকলেও খুব কষ্ট হয়। অন্যের ধারস্থ হতে হয়। লজ্জিত হতে হয়।

ঘরে আলো জ্বালানোর প্রদীপ বাতিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। সেজন্য হারিকেন ও কুপি-বাতি কয়েকটি করে রাখবে। যেন প্রয়োজনের সময় বিপাকে পড়তে না হয়। ভেতর ঘর ও বাহির ঘর সব জায়গায়ই আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখবে। যেন অন্ধকারে কেউ হোঁচট খেয়ে না পড়ে। আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকলে দুয়েকটা বাতি সবসময় অতিরিক্ত রাখবে। কখন কোন বাতি নষ্ট হয়ে যায় কে জানে! তখন যেন পেরেশানী না হয়। অতিরিক্ত বাতিগুলো যেন কাজে লাগে।

ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিজের হাতে রাখবে। জিনিসপত্র মাপার সময় সামনে থেকে মাপাবে। কাউকে কিছু দিলে নিজ হাতে দিবে। এসব অন্যের দায়িত্বে ছাড়বে না। প্রতিটা জিনিস নিজের পর্যবেক্ষণে রাখবে। বে-ফিকির হয়ে থাকবে না। কোনোকিছু কিনতে দিলে দাম শুনে রাখবে। সামান্য মূল্যের জিনিস হলেও। দাম সম্বন্ধে জানাশোনা না থাকলে অনেক সময় বিপাকে পড়তে হবে।

হিসাব ও পরিমিতিবোধ

প্রথমে তুমি তোমার ঘরের লোকজনের হিসাব করো। পরিবারের সদস্য যদি চারজন হয়, তাদের সঙ্গে যদি একজন বাচ্চা থাকে তাহলে এক হিসাব। এরচেয়ে বেশি কম হলে আরেক হিসাব। এই হিসাবের ফায়দা বহুমুখী। সংসারের খরচ-পরিকল্পনা, জিনিসপত্র কেনাকাটা, খাবার ও অন্যান্য জিনিস পরিবেশন করা ইত্যাদি কাজে এই হিসাব খুব কাজে লাগে।

কম সদস্যের সংসারে যদি একসাথে অনেক জিনিস কেনা হয়, তাহলে দেখা যায় ব্যবহার করার আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। আবার বেশি সদস্যের সংসারে কম জিনিস কেনা হলে ঘনঘন বাজারে যেতে হয়। এসব বিষয় খুব খেয়াল করবে। অনুমান ও আন্দাজ ঠিক করবে। আন্দাজের যোগ্যতা অনেক বড় যোগ্যতা।

যদি হিসাব করে চলতে পার তাহলে অপচয় থেকে বেঁচে যাবে। বিভিন্ন দিক থেকে সাশ্রয়ও হবে। তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। সাধ্য অনুযায়ী প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে।

শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনা

ঘর গোছানোর জন্য শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনার খুব প্রয়োজন। শৃঙ্খলা না থাকলে ঘরে শান্তি পাওয়া যায় না। সব সময় অশান্তি লেগেই থাকে। যদি সুব্যবস্থাপনার সাথে সবকিছু না করা হয়, তাহলে সংসারের খরচ অনেক বেড়ে যায়। তখন আরামের বদলে কষ্ট এসে বাসা বাঁধবে।

সংসারের খরচ চালানোর জন্যে কখনো ঋণ করবে না। কম খরচে চলার চেষ্টা করবে। পয়সা না থাকলে প্রয়োজনকে দমিয়ে রাখবে। হাত খালি থাকলে কোনোকিছু কেনার কথা ভাববে না। কারণ এক মাসে ঋণ করলে পরের মাসে চাপ পড়বে। তখন খুব কষ্ট হবে। আর ঋণের বোঝা মাথায় থাকলে ডাল ভাতও সুস্বাদু করে রাঁধতে পারবে না। আরামে খেতে পারবে না।

জিনিসপত্র রাখার জায়গা পাকা হলে ভালো। তা না হলেও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। সেখানে যাঁতা, চালনি, দাড়িপাল্লা, বাটখারা সব রাখবে। প্রথমে একবার সবকিছু মেপে তালাবদ্ধ করে রাখবে। যদি কোনো জিনিস অতিরিক্ত থেকে যায়, সেগুলো বের করে আনবে। তোমার সুষ্ঠু বণ্টন ও সুব্যবস্থাপনার কারণে কোনোকিছু উদ্বৃত্ত থাকলে সেগুলো আলাদা করে রাখবে। যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পার, তাহলে নিশ্চিত অনেক কিছু বেঁচে যাবে। খরচও বাঁচবে। তখন সেগুলো দিয়ে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে।

অনেকে খরচ বাঁচাতে পারে, তবে সেগুলো স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। তার কাছ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ ঠিকই আদায় করে। এরপর উদ্বৃত্ত অর্থগুলো নিজের কাছে রেখে দেয়। কেউ কেউ তো উদ্বৃত্ত অর্থ থাকার পরও স্বামীকে পেরেশান করে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার মাধ্যমেই সংগ্রহ করে। এটা খুবই মন্দ কথা। উদ্বৃত্তের উদ্দেশ্য তো হলো স্বামীকে আরাম দেওয়া এবং তার বোঝা হালকা করা। সেটা না হলে তো সব চেষ্টাই বেকার।

আমার কথা হলো, নিজের মেধা বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু করবে স্বামীর আরামের জন্য করবে। তার মাধ্যমেই তো তুমি কতকিছু পাচ্ছ। অতএব তার আরামের ব্যবস্থা করা তো কৃতজ্ঞতারই

অংশ। তিনি যদি এতকিছু না করতেন, কোত্থেকে কী হতো? অতএব তার ত্যাগ ও কষ্টকে মূল্যায়ন কর। তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আল্লাহ তাআলার দরবারেও কৃতজ্ঞতা আদায় কর।

আমি তোমাকে সবগুলো বিষয় হাতেকলমে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এরপরও যদি কিছু করতে না পার সেটা তোমারই অযোগ্যতা। কিংবা বলা যায়, তোমার স্বামীর দুর্ভাগ্য!

তুমি যদি বল, প্রয়োজন পরিমাণ জিনিস আমার ঘরে থাকে না। আমি সবসময় বিভিন্ন জিনিস আনতে বলি। তিনি আনেন না। আমি বলব, এ ধরনের আপত্তি যথার্থ নয়। সুষ্ঠুভাবে খরচ করলে কম জিনিসেই কাজ হয়ে যায়। তুমি বরং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুণ অর্জন কর। স্বামী যা আনেন তা দিয়েই সংসার চালানোর চেষ্টা কর। একটু কষ্ট করেই চল। যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সবকিছু কর; অভিযোগের পথ অবলম্বন করো না। ইনশাআল্লাহ তাতে তোমার জন্য যেমন কল্যাণ, তোমার স্বামীর জন্যও কল্যাণ এবং পুরো পরিবারের জন্য কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কল্যাণ হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

বাড়িতে কোনো একটি জায়গা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নাও। হোক না মাত্র একটি কামরা, সেটাকেই নিজের মতো করে নাও। যেখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কাপড় চোপড় রাখার আলনা, অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য আলমারি, হাত ধোয়া ও ওযু করার জায়গা, পানি চলে যাওয়ার ছোট্ট নালা, আলো ও বাতাস আসার খিড়কি ইত্যাদি।

কামরা ছোট হলেও সমস্যা নেই। শুধু একটি খাট আর অতি জরুরি কিছু জিনিস থাকতে পারলেই চলবে। সেই খাটে সবসময় পরিষ্কার একটি চাদর বিছিয়ে রাখবে। যেন কেউ চাইলে সেখানে বিশ্রাম করতে পারে। সতর্কতামূলক তার উপর কোনো পর্দা বা অন্যকোনো কিছু বিছিয়ে রাখতে পার। যাতে কয়েকদিনের মধ্যেই ময়লা লেগে বিশ্রী না হয়ে যায়।

খালি খাটে চাদর বিছাবে না। নিচে চাটাই অথবা তোষক দিয়ে নিবে। তোষকের উপর চাদর বিছাবে। তার উপর বালিশ।

ঘরে একটি চুলা থাকলে ভালো। সেটা সাধারণ চুলা হতে পারে, কিংবা বৈদ্যুতিক চুলা। অথবা তেলের বা গ্যাসের চুলা। চুলাটি সুবিধামতো কোনো এক পাশে রাখলে ভালো। সঙ্গে দিয়াশলাই ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখবে। যেন প্রয়োজনের সময় খুব সহজেই যে কারো খেদমত করতে পারো। আলমারিতে কাপ পিরিচ রাখবে। সঙ্গে চা পাতা ও চিনি। এসবের জন্য যেন এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে না হয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা নাস্তা প্রস্তুত করে নাও। চাইলে পানি গরম দিয়ে নামায শুরু করতে পারো। এরইমধ্যে কিছুক্ষণ কোরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর। এরপর চা প্রস্তুত কর।

কামরা সব সময় খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। ঘরে একটা পিকদান বা চিলমচি রাখ। যেন কখনো ঘরের মেঝেতে থুথু ফেলতে না হয়। কারণ থুথুর মাধ্যমে রোগ জীবাণু ছড়ায়। আশপাশ বিশ্রী হয়ে যায়।

প্রয়োজন হলে কয়েকটা পিকদান রাখ। জগ, গ্লাস, পেয়ালা, পাত্র এবং লোটা-বদনাও একাধিক থাকতে পারে। কলসীও সম্ভব হলে একাধিক রাখবে। যেন প্রয়োজন পরিমাণ

পানি সংরক্ষিত থাকে। বদনা কখনো মেঝেতে রাখবে না। জলচৌকির প্রয়োজন এজন্যেই। জলচৌকিতে বসে ওযু করবে।

নামায আদায় করার পর জায়নামায ভাঁজ করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে।

খাদ্য সামগ্রী কমপক্ষে এই পরিমাণ সংগ্রহে রাখার চেষ্টা করবে, যেন সপ্তাহের মাঝখানে বাজারে যেতে না হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে দেখবে ঘরে কোনো ময়লাই থাকবে না। কোনো জিনিস নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্যত্র পেলে সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে রাখবে। আর একই ধরনের জিনিসগুলো কাছাকাছি রাখবে।

দিনে কমপক্ষে দুইবার ঘরদোর ঝাড়ু দিবে। ঘরদোর এমনভাবে গুছিয়ে রাখবে, যেন সবখানেই খুব সহজে ওযু ও নামাযের ব্যবস্থা করা যায়। সব কামরায় নামাযের চৌকি না থাকলেও চাটাইয়ের ব্যবস্থা রাখবে। যে কামরায় পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকে, সেই কামরায় বসার ও শোয়ার ব্যবস্থা রাখবে। এমনিভাবে আরামের অন্যান্য সামগ্রীও সেই কামরায় রাখবে। তাহলে কারও আরামের প্রয়োজন হলে সেখানে যেতে আগ্রহ পাবে।

যে ঘরে কেবল সামানাপত্র রাখা হয়, প্রতিদিন সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি বুলাবে। যেন ইঁদুর তেলাপোকা বাসা বাঁধতে না পারে। সেইসঙ্গে খেয়াল রাখবে, সেই ঘরের জিনিসগুলো সুবিন্যস্তভাবে রাখা আছে কিনা। প্রয়োজনের সময় সহজেই কোনো জিনিস বের করা যাবে কিনা!

সাধারণ সামানাপত্রের ঘরে কাপড় চোপড়ের বাক্স রাখবে না। কাপড়ের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য কিছুতেই রাখবে না। তাহলে ইঁদুর এসে সেগুলো নষ্ট করবে। কাপড় চোপড়ের বাক্সের দিকে নিয়মিত খেয়াল রাখবে। বেখেয়ালিতে যেন সেখানে পোকা মাকড়ের দল বাসা বাঁধতে না পারে।

আকল ও স্বভাবযোগ্যতা

সন্তান প্রতিপালন

সন্তান প্রতিপালন খুব কঠিন কোনো কাজ নয়। সন্তানের মহব্বতই সবকিছু শিখিয়ে দেয়। তবে সেজন্য আকল ও স্বভাবজাত যোগ্যতা থাকতে হয়।

যার মাঝে স্বভাবযোগ্যতা নেই, তার ও তার সন্তানের জীবন খুব কঠিন হয়। সেই সন্তানের বয়স বাড়ে ঠিক, কিন্তু মানুষ হয় না। সে কথা বলার তরীকা যেমন জানে না, চুপ থাকার তরীকাও জানে না। যেখানে কথা বলা দরকার সেখানে চুপ থাকে। যেখানে চুপ থাকা দরকার সেখানে যা মুখে আসে বলে ফেলে।

সে খানাপিনার আদব-কায়দাও জানে না। পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের নিয়মও জানে না। দেখা যায়, তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু কোনো খবরই নেই। অসুখ হয়েছে, চিকিৎসার চিন্তাও নেই। কোনো কিছুর বাছ-বিচার নেই। যেন শুধু হায়াত আছে বলে বেঁচে আছে। মৃত্যু এসে গেলে মারা যাবে। আর সে মারা গেলে মায়ের আপদ দূর হবে!

এমন অসচেতন মায়ের জন্য সন্তান লাভ করা এক কঠিন পরীক্ষা। এক সন্তানই তার জন্য

সাক্ষাৎ মৃত্যু।

কিন্তু যার স্বভাবযোগ্যতা আছে, আকল বুদ্ধি ও গৃহিণীসুলভ শৃঙ্খলাবোধ আছে, সন্তান মানুষ করা তার জন্য মোটেও কষ্টকর নয়। সন্তান তার কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ফলে অত্যন্ত যত্নের সাথে সে তার সন্তানকে লালন পালন করে। সে তার স্বামীর আনুগত্যও করে। আর এইসব কাজকে সে গর্বের বিষয় মনে করে। সে খুব অল্প আয় দিয়েই এত সুন্দরভাবে সংসার পরিচালনা করে যে, কাছের দূরের সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

সন্তান প্রতিপালনের সহজ তরীকা

প্রিয় মেয়েরা!

আমি তোমাদেরকে সন্তান প্রতিপালনের সহজ তরীকা বলে দিচ্ছি। তোমরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করবে। যাতে সারাদিনের কাজকর্ম খুব সহজভাবে আঞ্জাম দিতে পার। তার মাঝে এক আধঘণ্টা আরাম করারও সুযোগ পাও।

নিয়ম হলো, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাদেরকে পেশাব পায়খানা থেকে ফারেগ করে আবার শুইয়ে দিবে। বিছানা ও বাচ্চার কাপড় আগে থেকেই ঠিক করে রাখবে। তোষক এবং তোষকের উপর চামড়ার বিছানা বা অয়েল ক্লথ বিছিয়ে রাখবে। প্রয়োজন হলে তার উপর আলাদা ছোট কাঁথা রাখবে। শিথানের বালিশের সাথে কোল বালিশও রাখতে পার। এসব খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যেন প্রয়োজনের সময় কষ্টে পড়তে না হয় এবং অপরিচ্ছন্নতার দরুন রোগ জীবাণু ছড়াতে না পারে।

বাচ্চার জন্য টুকটাক কিছু ওষুধ সব সময় হাতের কাছে রাখবে। যে কোনো সময় সেগুলো কাজে লাগতে পারে। আগে থেকে ব্যবস্থা না থাকলে হঠাৎ প্রয়োজন হলে পেরেশান হতে হয়। যেমন, কোনোদিন যদি রাতের বেলা বাচ্চার শরীর খারাপ হয়ে যায়। বাচ্চার কান্না যদি কিছুতেই না থামে। বিছানায় যদি বাচ্চা ছটফট করতে থাকে। তখন এই ওষুধগুলো হাতের কাছে থাকলে পেরেশানী হালকা হয়ে যাবে। এবং আশা করা যায় বাচ্চার অবস্থা দ্রুত ভালো হয়ে যাবে।

ওষুধপাতির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিও রাখবে। যেমন, ছোট হামান দিস্তা, শিল, পাটা, পোতা, কয়লা, দিয়াশলাই, তুলা, কাপড়, চামচ, মগ, গ্লাস, ছোট পাতিল, বিভিন্ন জাতের তেল, বিভিন্ন গাছ গাছড়ার ওষুধ ইত্যাদি।

সম্ভব হলে বাড়ির আঙিনায় কিংবা বেলকনিতে দুয়েকটি ওষুধি গাছ লাগিয়ে রাখতে পার। কয়েকটি ফুলের গাছ লাগাতে পার। এতে পরিবেশও সুন্দর হবে, ঘ্রাণও পাওয়া যাবে। আবার প্রয়োজনের সময় এগুলো খুব কাজে আসবে।

তুমি গ্রামে কিংবা শহরে যেখানেই থাক সেখানের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সবসময় সংগ্রহে রাখবে। এগুলো তোমার সংগ্রহে থাকলে দেখবে খুব সহজেই অনেক মুশকিল আসান হয়ে গেছে। ছোট বড় অনেক কাজ খুব সহজেই সেরে গেছে। এর জন্য অতিরিক্ত কোনো কষ্টও করতে হচ্ছে না। ফলে গৃহস্থালির কাজ যেমন স্বাভাবিক থাকবে, স্বামীর প্রয়োজনও পূরণ করতে পারবে, সন্তানের কাজও করতে পারবে, মানসিক প্রশান্তিও লাভ করবে।

দেখ, এগুলো খুবই সাধারণ কথা। টুকরো টুকরো বিষয়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এগুলো আর সাধারণ থাকে না। অসাধারণ হয়ে যায়। টুকরো বিষয় থাকে না। বড় বিষয় হয়ে যায়।

এগুলোর জন্য শুধু একটু মানসিক প্রস্তুতি দরকার। কর্মমনা যোগ্যতা দরকার। আর দরকার সামান্য কিছু ব্যবস্থাপনা। যেমন, তুমি তোমার বাচ্চাকে নিরাপদ ও আরামদায়ক জায়গায় শুইয়ে তার উভয় পাশে কোল বালিশ দিয়ে রাখলে। ব্যস। এরপর তুমি অনেকটা নিশ্চিন্তে নামায পড়তে পারবে। রান্নাবান্না করতে পারবে। একটু বেশি সময় পেলে কিছুক্ষণ কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারবে। দ্বীনী বই পুস্তক পড়তে পারবে। অন্যথা দেখবে, সারাক্ষণ বাচ্চা তোমাকে ব্যস্ত করে রাখছে। তুমি নিশ্চিন্তে কোনো কাজই করতে পারছ না।

বাচ্চারা সকালবেলা বেশ দেরিতে ঘুম থেকে উঠে। তুমি সেসময়ই অনেক কাজ করে নিতে পারবে। দ্রুত নাস্তা প্রস্তুত করে কিছুক্ষণ তিলাওয়াত করতে পারবে। দ্বীনী কিতাবাদিও পড়তে পারবে। কিন্তু সেসময়ও যদি ঠিকমতো বাচ্চাকে শোয়াতে না পার, বাচ্চার ঘুম ভেঙে যাবে।

সকালবেলা ছাড়া দিনের অন্য সময় এভাবে শুইয়ে রাখলেই তোমার জন্য বিভিন্ন কাজ করা সহজ হয়ে যাবে। মোটকথা, সুব্যবস্থাপনার সাথে কাজ করলে তুমি অনেকটা সময় সাশ্রয় করতে পারবে।

রান্নার সময় হলে যদি বুয়া থাকে তাহলে তাকে একসঙ্গেই সবকিছু দিয়ে কাজ বুঝিয়ে দিবে। যেন বারবার তোমার উঠতে না হয়। তাকে কাজ বুঝিয়ে তুমি এমন জায়গায় বাচ্চা কোলে নিয়ে বসবে, যেখান থেকে রান্নাঘরের দেখাশুনাও করা যায়। বাচ্চাকে সামলানো যায়।

মাঝেমধ্যে তুমি নিজেই পর্দা রক্ষা করে বাচ্চাকে একটু বাইরে নিয়ে যাও। কিংবা কারও কাছে পাঠিয়ে দাও। তাতে সে প্রাকৃতিক আলো বাতাস লাভ করবে। এটা তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য খুবই উপকারী। তবে বাইরে পাঠানোর আগে অবশ্যই হাত মুখ ধুইয়ে ভালো কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিবে। বাচ্চার জন্য উপযুক্ত সঙ্গী থাকলে আরও ভালো।

বাচ্চাকে কেউ বাইরে নিয়ে গেলে এসময় খুব দ্রুত তুমি অনেক ধরনের কাজ সেরে নিতে পারবে। তবে বাচ্চার ব্যাপারে সর্বাবস্থায়ই খেয়াল রাখবে। কখনো বেখবর হবে না।

বাচ্চার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কিছু নিয়ম করে নিবে। সবসময় তার খাওয়ার মতো কিছু জিনিস সংগ্রহে রাখবে। মনে রাখবে, বাচ্চা ক্ষুধার্ত থাকলে যে কোনো জিনিস সে মুখে দিবে। এতে শারীরিক ক্ষতি তো হবেই। অভ্যাসও খারাপ হয়ে যাবে।

বাচ্চাকে প্রথমে হালকা খাবার দিবে। এরপর খুব ধীরে ধীরে বিভিন্ন ধরনের খাবারে অভ্যস্ত করবে। প্রথমেই সবকিছু খাওয়াতে গেলে হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। পেটও ভারী হয়ে যাবে। তবে খাবারের ক্ষেত্রে রুটিন ও সময়ের ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখবে। যখন তখন যেকোনো জিনিস মুখে দিবে না।

বাচ্চাকে সব সময় কোলে রাখবে না। তখন সে কোলে থাকায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এতে তোমারও কষ্ট হবে। তারও অস্থিরতা থাকবে। অতএব এ বিষয়ে বিবেক বিবেচনাকে খুব কাজে লাগাবে। সময় সুবিধা চিন্তা করে সব করবে।

কাজকর্ম রেখে বাচ্চাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকবে না। অনেক মহিলারা এমনটা করে থাকে। বাচ্চাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে। এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ঘরের বাইরের কোনো খবর থাকে না। এতে পুরুষদেরও পেরেশান হতে হয়। মহিলাদেরও। কেউ কেউ তো পেরেশানীর পরোয়াও করে না। এটা খুবই মন্দ কথা। অনুচিত আচরণ।

সকালে সূর্য ওঠা পর্যন্ত শুয়ে থাকা খুবই খারাপ অভ্যাস। এমন মহিলাদের তো নামাযও ছুটে যায়। তাদের একটি বাহানা হলো, কাপড় নাপাক। অর্থাৎ রাতে বাচ্চা পেশাব করেছে।

মনে রাখবে, এই ছুতোয় নামায কাযা করার কোনো সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে এমন আচরণ অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সন্তানের নিয়ামত দান করেছেন। আর তুমি সেই নিয়ামতের বাহানা দিয়ে নামায কাযা করছ! এটা কত মন্দ কথা। এমন অভ্যাস থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং সকল মুসলমান নারীকে হেফাযত করুন। আমীন।

সন্তানের শিক্ষা দীক্ষা

সন্তান যখন কথা বলতে শিখে, প্রথমেই আল্লাহর নাম শেখাবে। সে যেন 'আল্লাহ' শব্দ বলার আগে অন্য কোনো কথা না বলে। এমন কিছু শেখাবে না যা আজকালের মানুষ শিখিয়ে থাকে। তারা প্রথমেই বিভিন্ন ইংরেজি ও হিন্দি শব্দ শেখায়। তুমি সতর্ক থাকবে সে যেন এমন কোনো শব্দ নিজে নিজেও শিখতে না পারে। তার সামনে এজাতীয় কোনো শব্দ উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকবে। বাচ্চাদের দিল দেমাগ খুব পরিচ্ছন্ন থাকে। তারা খুব দ্রুত যে কোনো কথা শিখে ফেলে। এমন কিছু শিখে ফেললে সেটা হবে খুবই আফসোসের বিষয়।

সর্বোপরি তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম বলানোর চেষ্টা করবে। প্রথম থেকেই যেন সে আল্লাহ তাআলার নাম ও সত্তার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। খুব সহজেই যেন সে তাঁর একত্ব, মহত্ত্ব ও বড়ত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারে।

সে তোমার কাছে কোনো কিছু চাইলে বলবে, আল্লাহর কাছে চাও। তাকে কিছু দেওয়ার সময় বলবে, এটা আল্লাহ দিয়েছেন। এভাবে ধীরে ধীরে তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বুনতে চেষ্টা কর। সকল কাজের শুরুতে তাকে বিসমিল্লাহ বলতে শেখাও। নিজেরাও কাজের শুরুতে আওয়াজ করে বিসমিল্লাহ বল।

মোটকথা তাকে এমনভাবে গড়ে তোল যেন প্রথম থেকেই সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চিনতে পারে।

কথা বলা শিখে গেলে তাকে কুরআন মাজীদের ছোট সূরাগুলো থেকে একটি একটি করে শব্দ শেখাও। সূরা ইখলাস, সূরা কাউসার ইত্যাদি সূরাগুলো এভাবেই মুখস্থ করিয়ে দাও। বুঝ বুদ্ধি হয়ে গেলে আয়াতগুলোর তরজমাও শোনাও। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য সূরা মুখস্থ করাও।

সন্তানের দেখাশোনা

বাচ্চাদেরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখ। সবসময় খেয়াল রাখ যেন তাদের মন মানসিকতা অন্য কোনো দিকে ঝুঁকে না পড়ে।

তাদের কোনো জিদ পুরা করতে যেও না। সেজন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস চাওয়ার আগেই তাকে দিয়ে দাও, যেন জিদ তৈরিই হতে না পারে। তার সঙ্গে এমনভাবে আচরণ কর যেন সে তোমার ব্যাপারে নির্ভয় হতে না পারে। তোমার ইশারা ইঙ্গিতই যেন তার সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়।

অতিরিক্ত মারপিট এবং বারবার কোনো বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাক। তা না হলে বাচ্চারা নির্লজ্জ হয়ে যায়। তাই কেবল ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাজ আদায়ের চেষ্টা কর।

সবসময় শক্তভাবে কথা বলো না। ছোট ভুলগুলোর ক্ষেত্রে তাকে বুঝিয়ে দাও। রাগের

মুহূর্তে যেন এমন কোনো কথা না বলে ফেল, যার কারণে পরে পস্তাতে হয়।

তার পক্ষ থেকে কাউকে গালমন্দ করো না। বরং কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে তার দোষকেই প্রধান মনে কর। এক্ষেত্রে কেবল তার কথার প্রতিই আস্থা রেখো না। অন্যদের কথাও শোনো। এরপর প্রতিটি কথা যাচাই করে দেখ। অন্তত পুরোপুরি যাচাইয়ের আগে কারও কথাকেই খাটো করে দেখো না। বাচ্চারা ভয় পেয়ে কখনো অসত্য কিছু বলতে পারে। ধোঁকার আচরণ করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তুমি অবহেলা করলে সে বারবার এই সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে।

পড়ে থাকা জিনিস হাতে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা ওই জায়গায় রেখে দিতে বল। সেই জায়গা দূরে হলেও সেখানে নিয়ে যেতে বল। তোমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হলে তুমিও তার সঙ্গে যাও। এবং তোমার সামনেই জিনিসটি সেখানে রাখতে বল। ভবিষ্যতে যেন এমন কাজ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক কর।

অন্যের কোনো জিনিসের সামনে তাকে দাঁড়াতে দিও না। এমন কোনো জিনিস যদি কেউ তাকে দিতে চায়, ভদ্রতার সাথে ফিরিয়ে দাও। অন্যের জিনিসের প্রতি যেন বাচ্চাদের লোভ বা আগ্রহ না হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কর।

মিথ্যা বলা, অন্যের দোষ বলা, কারও গীবত করা ইত্যাদি থেকে তাকে দূর রাখ। এসব করতে দেখলে নিষেধ কর। এসব যে খুবই মন্দ অভ্যাস সে কথা বুঝিয়ে বল।

তাকে শাসন করতে গিয়ে কখনো হেসো না। তার সঙ্গে অতিরিক্ত স্বাভাবিক হয়ে কথা বলো না। যাতে তোমার ও তার মাঝে থাকা আড়াল দূর না হয়ে যায়।

তার প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত প্রকাশ করো না। কোনো ক্ষেত্রে তার অন্যায় পক্ষপাত করো না। সকল সন্তানকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করো। একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিও না। যাতে একে অপরকে অবজ্ঞা করার সুযোগ না পায়।

বাচ্চাদের হাতে কখনোই টাকা-পয়সা দিও না। কোনো জিনিস তাদের প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই এনে দাও। সবার জন্য কোনো জিনিস আনলে সমানভাবে বণ্টন কর। বাচ্চাদের হাতে টাকা পয়সা দেওয়া এবং তাদের সকল ইচ্ছে পূরণ করতে চাওয়া মারাত্মক ভুল। এটা তার প্রতি মহব্বত নয়। এটা তার ক্ষতি করা।

মেয়েদের পর্দার বিষয়ে খেয়াল রাখা

মেয়েরা পর্দার বিষয়ে খুব গুরুত্ব দাও। যখন থেকেই তাদের বুঝ-বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সমবয়সী ছেলেদের থেকে পৃথক করে দাও। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিও না। কথা বলার সুযোগও দিও না। অন্য মেয়েদের সাথেও তাদেরকে একাকী ছেড়ে দিও না। সবসময় তাদেরকে কাছে কাছে রাখ। নিজেদের মর্যাদা ও আল্লাহর বিধান বুঝাতে শুরু কর। পর্দার গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝাতে চেষ্টা কর। উন্নত দ্বীনী চিন্তায় গড়ে তোলার মেহনত কর।

তাদেরকে অতিরিক্ত হাসি-তামাশায় অভ্যস্ত হতে দিও না। তাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে অযথা কোথাও নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করো না। মামা-খালাদের বাড়ি হলেও না। যদিও সেখানে যেতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো রাস্তা-ঘাটে বের হওয়ার বদ অভ্যাস এবং অতিরিক্ত ঘুরাফেরার আগ্রহ। কারণ, একদিন তোমার সাথে গেলে আরেকদিন অন্যের সাথে যাওয়ার বায়না ধরবে। এভাবে অতিরিক্ত বেড়ানোর প্রতি আগ্রহ হয়ে যাবে, যা মাতৃজাতির জন্য অনুচিত। অতএব প্রতিটি

কাজের ক্ষেত্রেই পরিণাম চিন্তা কর। ছেলে-মেয়ে সবার ক্ষেত্রেই পরিণাম-চিন্তা খুব জরুরি।

মেয়েদের পর্দা সম্পর্কে বেশি সচেতন হও। অশোভন প্রতিটি কথা ও কাজে তাদেরকে সতর্ক কর। তাদের মাঝে যেন স্বাধীন মনোভাব তৈরি হতে না পারে, খেয়াল রাখ।

তাদের কাপড়-চোপড় ও অলঙ্কারাদির ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা কর। এসব ব্যাপারে দ্বীনকে গুরুত্ব দাও। তাদের পছন্দের উপর ছেড়ে দিও না। তাদের জন্য মুসলিম নারীদের উপযোগী পোশাক ও অলঙ্কার নির্বাচন কর। এর ব্যতিক্রম করতে যেও না।

তাদেরকে যে কোনো ধরনের বই-পুস্তক পড়তে দিও না। কুরআন ও হাদীসের কিতাব পড়তে উৎসাহিত কর। নামাযের ব্যাপারে তাগিদ অব্যাহত রাখ। তাদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দাও। কম কথা বলার নসীহত কর। বেশি কথা বলার ক্ষতিগুলো বুঝিয়ে দাও।

মেয়েদের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা ও কম কথা বলা খুবই ভালো গুণ। তাছাড়া এই দুই গুণ সম্ভ্রান্ত মানুষেরও পরিচায়ক।

হাতের কাজ

বাচ্চাদেরকে অলস বানিও না। তাদের মাধ্যমে কাজ নাও। মেয়েদেরকে হাতের কাজ শেখাও। কাপড় সেলাই করতে দাও। রান্না-বান্নার কাজে শরিক কর। কখনো কোনো তরকারি তাকে একাই রান্না করতে দাও। গৃহস্থালি কাজকর্মে তার সাহায্য নাও। যেন এসব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন হয়। এগুলো যেন সে খুব ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারে।

সংসারের খরচপাতি তাকেই হিসাব করতে দাও। এরপর তার থেকে হিসাব বুঝে নাও। সবার জন্য কাপড়-চোপড় কেনা এবং ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের বিষয়গুলোও তাকে বুঝতে দাও। মোটকথা, যেসব বিষয় তোমার দায়িত্বে আসে এবং ভবিষ্যতে তার দায়িত্বেও আসবে বলে মনে হয়, সেসব বিষয়ে তাকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দাও। তবে সব দায়িত্ব কেবল তার উপরই রেখ না, তাহলে সে চলে গেলে তোমার জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাকে শুধু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে দাও। সেটা এমনভাবে কর যেন তুমিও তার মুখাপেক্ষী না থাক, সেও তোমার মুখাপেক্ষী না থাকে।

বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজে যেন এতটাই দক্ষ হতে পারে যে, অন্যরাও তার থেকে উপকৃত হয়। এসব বিষয়ের অভিজ্ঞতা মেয়েদের জন্য খুবই জরুরি। মেয়েরা অভিজ্ঞ হলে অতি অল্প আয়েও খুব ভালোভাবে সংসার চালাতে পারে। এতে সবাই খুব আরাম ও স্বস্তি পায়। তারা সবার দুআ পায় এবং অশেষ সওয়াব লাভ করে।

তাই যথাসম্ভব মেয়েদেরকে সংসার পরিচালনায় অভ্যস্ত করে তোল। তাদেরকে অলস ও নিষ্কর্মা হতে দিও না। কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাদেরই কল্যাণের জন্য। সে একটু কাজ করলেই যদি তোমার মায়া লাগে, তাহলে কিছুদিন পর যখন অনেক দায়িত্ব একসাথে এসে পড়বে তখন কেমন লাগবে? তখন তো সেই প্রবাদের মতো হয়ে যাবে যে,

আব পচতায়ে কা হোত জব চিড়িয়া চুগ গয়ি খেত
পাখি ফসল খেয়ে ফেলার পর আফসোস করলেই আর কী হবে*! [*অর্থাৎ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পর আফসোস করলেই আর কী হবে*?]*

মোটকথা এসব কাজ তো তার কাছে আসবেই। সেজন্য আগে থেকেই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা

হলে ভবিষ্যতে তার জন্য খুব সহজ হবে এবং আরাম হবে।

বাচ্চাদের প্রাথমিক চিকিৎসা

বাচ্চাদের শরীর দুর্বল হওয়ায় খুব সামান্য কারণেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। খাওয়া-দাওয়া একটু বেশি-কম হলে, ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে, নতুন কোনো জায়গায় গেলে এবং আবহাওয়া একটু পরিবর্তন হলেই বাচ্চাদের শরীরে নানান সমস্যা দেখা দেয়। কোনো কোনো বাচ্চা এমনিতেও একটু অসুস্থ থাকে। কখনো তাদের পেট খারাপ হয়, কখনো জ্বর আসে, কখনো চুলকানি দেখা দেয়, কিংবা অন্যকোনো রোগ প্রকাশ পায়। বড় ছেলে মেয়েদের মাথা ব্যথা হয়, পেট ব্যথা হয়, বুক ব্যথা করে, এমন আরও অনেক ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে মা যদি অভিজ্ঞ হন, তাহলে বাচ্চাদের রোগ বাড়তে পারে না। তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। আর যদি মা অনভিজ্ঞ হন, রোগ বাড়তে বাড়তে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন কাছে ধারে ডাক্তার থাকলে তো চিকিৎসা করা যায়। অন্যথা পেরেশানী বাড়তেই থাকে। আর ডাক্তারের কাছে গেলে ফি লাগে। অনেক সময় এগুলো বাড়তি খরচ হিসাবে সংকট তৈরি করে।

এজন্য মায়েদের উচিত, প্রাথমিক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। এগুলো জানা থাকলে বাচ্চারাও আরাম পায়। মা বাবার পেরেশানীও দূর হয়। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মুরুব্বীদের থেকে অভিজ্ঞতা হাসিল করবে।

মেহমানদারী ও আতিথেয়তা

মেহমানের আগমন সৌভাগ্যের বিষয়

হাদীস শরীফে মেহমানের ইকরাম ও খেদমতের প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাই মেহমান এলে খুব খুশি হবে। মনে রাখবে, মেহমান ভাগ্যবানদের ঘরেই আসে।

ঘরে মেহমান এলে তার জন্য উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করবে। স্মরণ রাখবে, মেহমান কখনো তোমাদের খাবার খাবে না। সে তার রিযিকই খাবে। তার খাওয়ার কারণে তোমাদের খাবার কমবে না। বরং তাকে খাওয়ানোর উসিলায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের রিযিক আরও বাড়িয়ে দিবেন।

তোমরা যা খাও, মেহমানকে তার চেয়ে ভালো খাওয়াতে চেষ্টা করবে। তার আপ্যায়নে ছোট মনের পরিচয় দিবে না। বিদায় নেওয়ার সময় তাকে কিছু হাদিয়া দিবে।

তিনি যেখানে থাকলে আরাম হবে, এমন একটি জায়গা প্রথমে তাকে দেখিয়ে নিবে। তারপর সেখানে বিছানা করে দিবে। সেখানে তার খাবার, নাস্তা ও চা সময়মতো পৌঁছে দিবে। কিছুক্ষণ পরপর খোঁজ নিবে—তার কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় কি না।

সে যদি কয়েকদিন থাকতে চায় তাহলে তার সঙ্গে এমন আচরণ করবে, যেন সে প্রতিদিনই নতুন মেহমান। অনেকদিন থাকলেও মেহমানের পূর্ণ মর্যাদা বজায় রাখবে। দীর্ঘদিন থাকছে বলে তার প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দিবে না। বরং আরও বেশি যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করবে। তার সকল প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করবে। সব সময় তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলবে।

সে তার জিনিসগুলো নিজের মতো করে রাখতে চাইলে তাকে উত্তম পরামর্শ দিবে। তার সঙ্গে কোনো খাদেম না থাকলে তোমাদের কাজের লোককে তার খেয়াল রাখতে বলবে। খাদেম কোনো কাজে অবহেলা করলে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে। মেহমানের সামনেই তাকে একটু ধমক দিবে। কারণ বর্তমান সময়ের কাজের লোকেরা তার মালিক ছাড়া অন্য কাউকে গুরুত্ব দিতে চায় না।

সে তার কাজ নিজেই করতে চাইলে এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। এতে খাদেমরা তার প্রতি অবহেলা করবে। তাকে অবজ্ঞা করার সুযোগ পাবে।

মেহমানের সেবা যত্ন

নিয়মিত মেহমানের খোঁজখবর নিবে। তার কিছু কাজ তুমি নিজেই করে দিতে চেষ্টা করবে। তার সঙ্গেই খাবার খাবে[৩][৩. স্পষ্ট কথা যে, এটা কেবল মাহরাম ও মহিলা মেহমানদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। পর্দা লঙ্ঘিত হয় এমন কোনো উপায়ে কাউকে আপ্যায়ন করার সুযোগ নেই। -অনুবাদক]। এতে সে স্বস্তি বোধ না করলে তার সুবিধামতো ব্যবস্থা করবে।

তার কোনো কথা বা কাজে আপত্তি করো না। যদিও সেটা তোমার অপছন্দ হয়। তোমার থেকে সে কোনো ঋণ নিলে পরিশোধের জন্য চাপ দিবে না। তবে নিজ উদ্যোগে পেশ করলে নিয়ে নিবে।

সকল কথা ও কাজে এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা তার জন্য স্বস্তিদায়ক হয়। এমন কোনো কথা বলবে না যা শুনে সে ভাবতে পারে, এখানে আমার অবস্থান দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে! এমন কোনো কাজ করবে না যা দেখে সে উপলব্ধি করে, আমার এই অবস্থান তাদের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে!

মেহমানকে কিছু বলতে হলে একান্তে বলবে। খাদেম-চাকরদের সামনে বলবে না। কারণ তারা অনেক সময়ই ছোট মনের অধিকারী হয়ে থাকে। তোমার মুখে কিছু শুনলে ওরাও সাহস পেয়ে যেতে পারে। সুযোগ পেলে ওরাও দুকথা বলে বসতে পারে।

কাজের লোকদের সাথে আচরণ

তোমরা হয়তো জান যে, কাজের লোক পাওয়া এখন কঠিন হয়ে গেছে। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়তো সেটা আরও কঠিন হবে। এখন যাদেরকে পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে প্রতিদিন ঝগড়া হয়। তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকে। ধমকা ধমকির মাধ্যমে কাজ নিতে হয়। সেজন্যই বলি, 'দিল জ্বালানোর চেয়ে হাত জ্বালানো ভালো।' অর্থাৎ তাদের মনে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজের হাতকে কষ্ট দেওয়া ভালো। তাই সব কাজ নিজে নিজেই করতে শিখ। কাজের অভ্যাস কর। আর যদি কাজের লোক রাখ, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো না। তাদের সঙ্গে হাসি তামাশাও করতে যেও না। উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের মন জয় করার চেষ্টা কর। নম্র ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের থেকে কাজ নাও।

তাদের ছোট ছোট ভুল ত্রুটি ধরতে যেও না। অন্যায় করলেই বকাঝকা শুরু করো না। তাদের কাজে তুমি নিজেও শরিক হও। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা কর। গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় অন্য কোনো কাজের হুকুম করো না। তাতে সেই কাজ না হলে তুমি কিছুই বলতে পারবে না। কিছু বলতে গেলে সেও দুকথা শুনিয়ে দিবে। তখন সইতেও পারবে না। কিছু করতেও পারবে না।

সবসময় তাদের দোষ ধরতে যেও না। যদি চাও, সময়মতো কাজ হোক এবং কোনো জিনিস নষ্টও না হোক, তাহলে তার কাছে কাছে থাক। তবে তাকে বুঝতে দিও না, তুমি পাহারা দিচ্ছ। সেজন্য উত্তম হলো তার কাজে তুমিও একটু সহযোগিতা কর। সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাছেধারে থাক।

তরকারির লবণ ইত্যাদি তুমিই চেখে দেখ। নয়তো পরিবারের লোকদের রুচি মাফিক নাও হতে পারে। তোমার স্বামীর খাবার তুমি নিজেই রান্না করার চেষ্টা কর। এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু কথা বলেছি।

তুমি যখন তার কাজ-কর্মে সহযোগিতা করবে এবং নিয়মিত সব দেখাশুনা করবে, তখন সে চলে গেলেও তোমার বেশি কষ্ট হবে না। তখন তুমি নিজেই সব কাজ করতে পারবে। অন্যথা সব কাজ পড়ে থাকবে। তোমার জন্য খুব চাপ হয়ে যাবে।

কাজের লোকদের বেতন-ভাতা মাসেরটা মাসেই দিয়ে দাও। তাদের বোঝা তোমার মাথায় রেখো না। কারণ সে যদি হঠাৎ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, আর দুয়েক মাসের বেতন বাকি থাকে, তাহলে সবগুলো টাকা তোমাকে একসাথে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যদি একসাথে দিতে না পার, লজ্জিত হতে হবে। সে বিভিন্নজনের কাছে একথা বলে বেড়াবে।

এখনকার কাজের লোকেরা তো প্রায়ই বলে, 'আমি আর থাকব না। আপনার কাজ করব না। পাওনা বুঝিয়ে আমাকে বিদায় দিন।' হয়তো সে ভাবে, 'এখন অনেক টাকা বাকি। সবগুলো টাকা একসাথে দিবে না। আমাকে বিদায়ও করবে না।' কিন্তু যখন তাকে পাওনা বুঝিয়ে দিবে, দেখবে সে চুপ হয়ে গেছে। তখন আর সে যাচ্ছে না। এজাতীয় অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে।

তুমি যদি নিয়মিত বেতন দিতে থাক, তাহলে তোমারও কষ্ট হবে না। তারও এ জাতীয় কথা বলার সুযোগ থাকবে না। তাই বলছি, কাজের লোক থাকলেও নিজে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন কর। সব ধরনের কাজকর্মে অভ্যস্ত হও। সব ধরনের রান্না-বান্না শিখে রাখ।

নিজে কাজ করার অভ্যাস কর

অনেক মহিলা বলে, আল্লাহ তাআলা যখন ধন-দৌলত দান করেছেন তখন আর কষ্ট করব কেন? কাজের লোক থাকার পরও নিজে কাজ করব কেন?

আমি তাদেরকে বলি, যদি কখনো কাজের লোক পাওয়া না যায় এবং তুমিও কাজ করতে না পার, তখন কী অবস্থা হবে? বাধ্য হয়ে তো তোমাকেই করতে হবে! তখন দেখা যাবে, তুমি রান্না-বান্না যেহেতু আগে থেকে শেখনি, তাই খাবার স্বাদ হবে না। তখন কী অবস্থা হবে? তুমি না হয় খেয়ে নিবে নিজের রান্না বলে। পরিবারের অন্যরা কী করবে? তখন কেমন পেরেশানী হবে?!

অতএব সব কাজই শেখা উচিত। কাজের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। দক্ষতা থাকা উচিত এবং অভ্যাস থাকা উচিত।

কোনোভাবেই সময় নষ্ট করো না। অযথা সময় অপচয় করো না। সব বিষয়েই নিজেকে যোগ্য করে তোল। গৃহস্থালির সব কাজেই নিজেকে অভ্যস্ত রাখ। তোমার কারণে যেন কারও কষ্ট না হয়, খেয়াল রাখ। তুমি যেন স্বামীর আরাম ও আনন্দের মাধ্যম হতে পার, সেই চেষ্টা কর।

অনেক বেকুব মেয়েদেরকে দেখেছি, সকাল সাতটা আটটা পর্যন্ত শুয়ে থাকে। তাদের কোনো খাদেমা থাকলে তো সে-ই কাজ করে। নয়তো তার স্বামীকেই কাজ করতে হয়। এটা কেমন লজ্জার কথা! স্ত্রী শুয়ে বসে আছে আর স্বামী পেরেশান হয়ে কাজ করছে!

মেয়েরা! নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোল না। এমন বদঅভ্যাস কিছুতেই ধারণ করো না। সংসার বুঝার চেষ্টা কর। নিজের সংসার নিজেই গোছাতে চেষ্টা কর। বড়রা তোমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। আর কত করবে? এতদিন তারা তোমাদেরকে আরামে রেখেছে, এখন তোমরা তাদেরকে আরামে রাখ। বৌ-বেটি তো এই সময়ই বেশি কাজে আসে। এখন যদি তোমরা তাদের দেখাশোনা না কর, কবে করবে? না কি অন্য কেউ এসে করে যাবে?

বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা কর। এতে তোমাদেরই লাভ। দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। অতএব সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব এখন তোমরাই নাও। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

আর শোনো, কাজের লোকদের সাথে কিছু কাজ করলেই তুমি চাকর হয়ে যাবে না। তোমার সম্মান আগের মতোই থাকবে। এতে বরং তোমার অভিজ্ঞতা আরও বাড়বে। কর্ম-অভ্যস্ততা অক্ষুণ্ণ থাকবে। পাশাপাশি তারাও খুশি হবে।

তোমাদের উপার্জন ভালো হওয়ায় যদি কাজের লোক রাখার সুযোগ থাকে, অবশ্যই রাখ। অন্যথা এমন জিদ করা ঠিক হবে না যে, কাজের লোক অবশ্যই রাখতে হবে! বেতন দিতে পার আর না পার!

শোন, গৃহিণী নারীরা সব কাজ নিজে নিজেই করে থাকেন। তারা নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করেন। কাজের লোক রেখে ঝামেলা বাড়াতে চান না। কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কাজের লোক রাখার সুবিধা যেমন আছে, ঝামেলাও আছে। এজন্যই তারা নিজের কাজগুলো নিজে করতেই পছন্দ করেন। নিজের সংসার নিজের মতো করেই গুছিয়ে রাখতে চান।

তাছাড়া তুমি যদি নিজেই কাপড় সেলাই করতে পার, বাচ্চাদেরকে নিজেই সামলাতে পার এবং রান্না করতে পার, তাহলে প্রতি মাসে তোমাদের কত টাকা বেঁচে যাবে! তা দিয়ে তোমরা কত কাজ করতে পারবে! সেইসঙ্গে কত অভিজ্ঞতা অর্জন হবে এবং কত সুবিধা তুমি উপভোগ করবে! এতে স্বামীও তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে। তোমার সন্তানরা এবং ঘরের অন্য সদস্যরাও তোমাকে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে তারাও নিজ হাতে নিজের কাজ করতে অভ্যস্ত হবে। আলাদা করে তাদেরকে তোমার শেখাতে হবে না। ফলে সার্বিকভাবেই বিষয়গুলো খুব সহজ ও সুন্দর হয়ে যাবে।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। হাড়ি পাতিল গুছিয়ে রাখবে। এসব কাজ খাদেমার দায়িত্বে রাখার দরকার নেই। অন্য কারও দায়িত্বেও না। এসব কাজ খুব গুরুত্বের সঙ্গে তুমিই করবে।

রান্না যেন সুস্বাদু হয়, চেষ্টা করবে। এর জন্য রান্নায় মনোযোগ অপরিহার্য। লবণ, পানি, মসলা ও তেল মাপমতো দেওয়া জরুরি। সেইসঙ্গে জরুরি হলো, একই খাবার বারবার রান্না না করা।

খাবার খাওয়ার জন্য আলাদা জায়গা ঠিক করে নিবে। বসার জায়গায় কিংবা শোবার

জায়গায় খাবে না।

সম্ভব হলে সবাই এক দস্তরখানে খাবে। আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা হলে সবাইকে খাওয়ানোর পর তুমি খাবে। যেন কোনো খাবার কম হয়ে গেলে লজ্জিত হতে না হয়। কয়েক প্রকারের তরকারি হলে ভালো। সঙ্গে আচার-চাটনিও রাখতে পার। কেউ পান খাওয়ায় অভ্যস্ত হলে তার জন্য পানের ব্যবস্থা রাখবে। পানের ব্যবস্থা আগে থেকেই রাখা উচিত। খাওয়া-দাওয়ার পর পান খোঁজাখুঁজি করা সুন্দর দেখায় না।

খাবার বণ্টনের কাজ তুমি নিজেই করবে। কাজের লোকদের দায়িত্বে দিবে না। এটা খুবই অসুন্দর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। সবাইকে খাওয়ানোর পর কাজের লোককে যা দেওয়ার দাও। এরপর কিছু বেঁচে গেলে সেটা যত্নের সাথে রাখ।

চুলায় রান্না রেখে কখনো ঘর থেকে বের হবে না। অন্য কোনো কাজও শুরু করবে না। এতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। রান্নার কথা ভুলে যেতে পার। তখন খাবার এবং পাতিল সব পুড়ে যেতে পারে। ঝোল শুকিয়ে যেতে পারে। তাতে খাবারের স্বাদ নষ্ট হতে পারে। এমন আরও অনেক কিছু হতে পারে। অতএব এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে।

সব সময় ঘরে থাকার চেষ্টা করবে। অযথা ঘোরাঘুরি করবে না। এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস ভালো না। প্রয়োজন হলে বের হবে। প্রয়োজন সেরে গেলে ঘরে ফিরে আসবে। বের হওয়ার আগে ঘরের অবস্থা ভালোভাবে দেখে যাবে। সবকিছু স্বাভাবিক রেখে তবেই বের হবে।

কারও মাধ্যমে বাজার সদাই করলে জিনিসগুলোর দাম জেনে নিবে। পরবর্তী কেনাকাটায় সেই হিসাব অনুযায়ী পরিকল্পনা করবে। কেনাকাটার পর জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখবে। তরি-তরকারি প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে। যে জিনিস যেভাবে রাখা দরকার সেভাবেই রাখবে। এসব বিষয়ে অবহেলা করবে না। অনেক সময় গুছিয়ে না রাখা কিংবা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে না রাখার কারণে জিনিস নষ্ট হয়। তাতে ক্ষতি যেমন হয় তেমনি বরকত থেকেও মাহরূম হতে হয়। তাছাড়া সেটা অযত্নশীলতারও প্রমাণ সাব্যস্ত হয়।

যতদূর সম্ভব কাজের বুয়া বা খাদেমার উপর এই দায়িত্ব ছেড়ে দিবে না। নিজেই করবে। ক্ষতি হলে তোমারই হবে, তুমিই কষ্ট পাবে। অন্য কেউ করলে তোমার ক্ষতি তো তোমারই। কষ্টও তোমার। সঙ্গে অতিরিক্ত পেরেশানী এবং মেজায খারাপ হওয়া। তখন হয়তো দুর্ব্যবহারও করা হবে। সেটাও আরেক পেরেশানী।

অনেক মহিলা তো কাজের বুয়ার উপর সব দায়িত্ব দিয়ে দেয়। নিজে সংসারের কোনো খবর রাখে না। কেবল গল্প-গুজব আর আরাম আয়েশে দিন কাটায়। ঘরে বাজার সদাই কী আছে কী নেই, জানে না। কী রান্না হচ্ছে, কেমন হচ্ছে, খোঁজ রাখে না। যখন যেমন পায় খেয়ে নেয়। নিজের ব্যাপারেও উদাসীন, স্বামীর ব্যাপারেও। মেহমানের সুবিধা অসুবিধা তো গুরুত্বই পায় না। এটা কী কোনো জীবন? এমন উদাসীনতার পরিণতি কখনো ভালো হয় না। মানুষ তো বিয়ে করে শান্তির জন্য। কিন্তু বউয়ের এমন উদাসীনতা মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। যে মহিলা তার স্বামীর যত্ন নেয় না, সে কেমন স্ত্রী? তার বর্তমান ভবিষ্যৎ কেমন যেন অনিরাপদ!

তুমি যদি আমার নসীহতের উপর আমল কর, দেখবে সংসার কেমন গোছালো থাকে। তুমি কেমন সুখী থাক আর তোমার স্বামী কেমন খুশি থাকে। বাড়ির পরিবেশ কেমন সুন্দর ও শান্তিময় থাকে।

তুমি ভালো থাকলে এবং সতর্ক থাকলে কাজের লোকেরাও ভালো থাকবে। অন্যায় করবে

না। খিয়ানত করবে না। তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। তোমার সংসারের প্রতি আন্তরিক হবে। তোমার আদেশ নিষেধের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবে। ঠিকমতো কাজ করবে।

এবার আমি তোমাকে আরও কিছু নসীহত করতে চাচ্ছি, যেগুলো তোমার বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়িতে খুব কাজে আসবে। সে অনুযায়ী আমল করলে ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুফল দেখতে পাবে।

কিছু নসীহত

ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর। সকল কাজেই তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা কর। তাঁর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কথা বলো না। তাঁর অপছন্দের কোনো কাজ করো না। এমন কিছু হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা কর।

সময়মতো নামায আদায় কর। নামাযে পূর্ণ মনোযোগ ধরে রাখার অভ্যাস কর। কুরআন মাজীদ দৈনিক তিলাওয়াত কর। এ ব্যাপারে কোনো গাফলতি করো না। মুখস্থ অংশ ভুলে গেলে দ্রুত ইয়াদ করে নাও।

সব সময় সত্য কথা বল। কখনো মিথ্যা বলো না। সন্দেহপূর্ণ কথা বলা থেকে বিরত থাক। কোনো কথার মন্দ প্রতিক্রিয়া হবে মনে হলে সেটাও পরিহার কর।

কোনো বিষয়ে মানুষকে ভয় করো না। সবক্ষেত্রে কেবল আল্লাহকে ভয় কর। মানুষ কীইবা করতে পারে! কিন্তু আল্লাহ তাআলার পাকড়াও বড় কঠিন। তবে তিনি অত্যন্ত দয়ালুও বটে।

সবার সাথে ভালো আচরণ কর। নম্রভাবে কথা বল। কারও সাথে দুর্ব্যবহার করো না। কারও দোষ চর্চা করো না। সম্মুখেও না, আড়ালেও না। সম্মুখে করলে সে কষ্ট পাবে। আড়ালে করলে গীবত হবে। আর গীবত অনেক বড় গোনাহ।

নিজের দোষ-ত্রুটি দেখতে চেষ্টা কর। কসম দিয়ে কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। কয়েকজনের উপস্থিতিতে কারও সাথে গোপনে কথা বলো না। তাতে অন্যদের যেমন কষ্ট হবে, তোমার ব্যাপারেও মন্দ ধারণা তৈরি হবে। ভালো কথা বললেও এভাবে বলবে না।

সমবয়সী বা সমমর্যাদার অধিকারী দুই ব্যক্তিকে কিছু দিতে চাইলে সমান দিবে। কমবেশি করলে তোমাকে বেকুব বলা হবে। আর যে কম পাবে সে অপমানিত বোধ করবে। দুজনের মাঝে একজনের প্রশংসা করবে না। উভয়কে সমান খাতির যত্ন করবে। কারও মনে কষ্ট দিবে না।

পরিবারের বাইরের লোকজনের সাথে বেশি মেলামেশা করবে না। তাদের কাছ থেকে কোনোকিছু আশাও করবে না। এসব ক্ষেত্রে তোমার ধারণা অনুযায়ী কিছু না হলে খুব মন খারাপ হবে। কথায় আছে যে,

কাহাঁ রহতি হ্যায় ওহ কিমাত জাহাঁ চিনি মে বাল আয়া
“(থালাবাসন ধোয়ার পরও পরিবেশনের সময়) বাসনে চুল থেকে গেলে যত্ন-পরিচ্ছন্নতার আর কী মূল্য থাকে?” অর্থাৎ সবকিছু ঠিক থাকার পরও সামান্য অনিয়মে অনেক সময় খুব পেরেশান হতে হয়।

কাউকে মহব্বত করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করবে। তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তা কাজে আসবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি কর। তাদের কেউ তোমার সাথে দুশমনি করলেও তুমি মহব্বত বজায় রাখ। তোমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করলেও তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার কর। বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব তো সবাই বজায় রাখে। শত্রুর সাথে ভালো ব্যবহার সবাই করে না। অথচ আল্লাহ তাআলা তাতেই বেশি খুশি হন।

ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হও। বিভিন্ন কাজে তাদেরকে সাহায্য কর। যোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য মেহনত কর।

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অনুগ্রহ কর। প্রয়োজনে তাদেরকে ঋণ দাও। কোনো অনুগ্রহ করলে খোঁটা দিও না। ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দিও না।[৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং : ২৭১৩৬]

কোনো বিষয়ে তারা রেগে গেলে তুমি নরম হয়ে যাও। বিনয়ের সুরে কথা বল। তাদের রাগ দূর করার চেষ্টা কর। কখনো তারা দুর্ব্যবহার করলে তুমি ওসব মনে রেখ না।

কারও স্বভাবে কৃপণতা থাকলে তার থেকে কখনো ঋণ নিও না। এতে অনেক সময় লজ্জিত হতে হয়। কারণ, কৃপণের মন খুব ছোট থাকে। অল্পতেই সে ভেঙে পড়ে। তবে সে কোনোকিছু চাইলে তুমি দিতে চেষ্টা কর। কারণ, অল্প জিনিসকেই সে অনেক মনে করবে। তোমার অনুগ্রহের প্রতি সে কৃতজ্ঞ হবে।

যাদের স্বভাবে নেতৃত্ব আছে, তাদের সাথে খুব বেশি মিশবে না। তাদের সাথে কথাবার্তা খেয়াল করে বলবে। প্রয়োজন ছাড়া তাদের কাছে না যাওয়াই ভালো। তাদের সঙ্গ নিবে না। তাদের কাছে গেলে যে কোনো বিষয়ে কথা বলবে না। অযথা তাদেরকে উত্তেজিত করবে না।

আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে গেলে খুব সতর্ক হয়ে থাকবে। হিসাব করে কথা বলবে। প্রত্যেকের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবে। তাদের ঘরের জিনিসগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে যাবে না। নতুন কিছু দেখলে বিস্মিত হবে না। বিস্ময় জাগলেও তা প্রকাশ করবে না।

সবার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রাখবে। আচরণ-উচ্চারণে বিনয়ী থাকবে। শান্ত ভঙ্গিতে খাবার খাবে। সামনে যা দিবে তাই খাবে। অন্যকিছু তালাশ করবে না। এদিক ওদিক হাত বাড়াবে না। খেতে বসে বেশি কথা বলবে না। বাচ্চাদেরকে আগে-পরে খাইয়ে নিবে। তাদের সঙ্গে খাওয়া শুরু করবে না। তোমার সঙ্গেও তাদেরকে খাওয়াতে যাবে না।

কারো বাড়িতে গেলে সাধ্যমতো কিছু হাদিয়া নিয়ে যাবে। একেবারে খালি হাতে যাবে না। মাহরাম পুরুষের সঙ্গে যাবে। কাছে ধারে হলেও অন্তত কোনো মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। একা একা যাবে না। অন্যের কাপড় পরে যাবে না। আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দিয়েছেন সেটাই তোমার জন্য উত্তম। অন্যের জিনিস নিয়ে গেলে কখনো খুব পেরেশান হতে হয়। জিনিসটি কখনো ক্ষতিগ্রস্তও হয়। তখন মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। সেজন্য আগে থেকেই সতর্ক থাকা ভালো। তাছাড়া কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে অন্যের জিনিস ব্যবহার করা মানায় না।

আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা মন্দ স্বভাব

আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করা খুবই মন্দ অভ্যাস। এই অভ্যাস কিছুতেই গ্রহণ করো না। আগে থেকেই এই অভ্যাস থাকলে খুব দ্রুত পরিহার কর। এমন অভ্যাস মারাত্মক ভোগান্তির কারণ হয়।

ধরো, তোমাদের মাসিক আয় তিনশ রুপি। কিন্তু এক মাসে খরচ করলে চারশ রুপি। তাহলে পরের মাসে খরচ করতে হবে দুশো রুপি। অন্যথা বকেয়া বাড়তেই থাকবে। কিংবা ঋণ করে চলতে হবে। আর এ দুটোই সংসারে অশান্তি ডেকে আনে।

মনে রাখবে, মানুষের প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না। সব খরচ করে ফেললেও প্রয়োজন থেকে যাবে। সেইসঙ্গে থেকে যাবে পেরেশানী। এজন্য খরচের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ কর। যা-ই কর, পরিণাম চিন্তা করে কর। হাদীসের এই বাণী স্মরণ রাখ—

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

'যে ব্যক্তি *(খরচাদিতে)* মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সে কখনো দারিদ্র্যগ্রস্ত হয় না।'

প্রতিটি কাজ পরামর্শের মাধ্যমে কর। এতে আল্লাহ তাআলার সাহায্যও লাভ হবে। মানুষের কাছে জবাবদিহিতা থেকেও রক্ষা পাবে। প্রতিটি কাজ নিজের অবস্থান অনুযায়ী কর। তাহলে লজ্জিত হতে হবে না। বিপাকে পড়তে হবে না।

আজকাল মানুষ অপচয় করতে পছন্দ করে। হিসাব করে খরচ করলে তাকে কৃপণ বলে। অথচ অপচয় কত বড় গোনাহ! অপচয়কারী সব ধরনের বরকত থেকে মাহরূম থাকে। তাছাড়া সেই অপচয়ে কী ফায়দা যে, প্রথমে অপচয় করল পরে অন্যের ধারস্থ হলো!? তখন তো পুরোটা সময় পেরেশানীতে কাটে!

আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সম্পদ দিয়ে থাকেন, সেগুলোকে আল্লাহর পছন্দমতো ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। তাতে দুনিয়া ও আখেরাতের ফায়দা পাবে। অনর্থ খরচে তো গোনাহ ছাড়া কিছু পাবে না।

তোমার তো উচিত, নিজের প্রয়োজনকেও সংক্ষেপ করা এবং এর মাধ্যমে সম্পদ বাঁচানো। তারপর সেই সম্পদ তোমার আত্মীয়দের মাঝে খরচ করা। প্রয়োজনগ্রস্তদেরকে হাদিয়া দেয়া। তাতে তুমি অনেক লাভবান হবে। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আত্মীয়রাও খুব খুশি হবে।

মোটকথা, খরচের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন কর। কোনো কারণেই যেন ঋণ করতে না হয়, খেয়াল রাখ। স্বামীকেও যেন পেরেশান হতে না হয়, লক্ষ রাখ।

স্বামীর কাছে কখনো কোনোকিছু চাওয়ার চেষ্টা করবে না। তিনি তোমাকে যা দেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। সেটাকেই গনীমত মনে করবে। সব বিষয়েই তাকে স্বস্তি ও আরাম দেওয়ার চেষ্টা করবে।

হে আমার মেয়ে! এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখলে তোমার জীবন সত্যিই সুন্দর হবে। তোমার দাম্পত্য মধুর হবে। সকলের সুদৃষ্টি লাভ করবে। সবার দিলের দুআ পাবে। ইনশাআল্লাহ।

সবার সাথেই উত্তম ব্যবহার কাম্য

নিজের আত্মীয়-স্বজন ও মা-বাবার আত্মীয়-স্বজন—সবার সাথেই উত্তম ব্যবহার করবে। তাদের সুখ-দুঃখে শরিক হবে। তাদের খুশিকে নিজের খুশি মনে করবে। তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করবে। প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদেরকে সাহায্য করবে।

সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তাআলাও তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। সবার জন্য কল্যাণ কামনা করবে, তাতে আল্লাহ তাআলা অনেক খুশি হবেন। তোমার সঙ্গে তিনি দয়া ও মায়ার আচরণ করবেন। সকল ক্ষেত্রেই তুমি তাঁর মেহেরবানী লাভ করবে।

'উপকার করলে মানুষ ক্ষতি করে' এমন ধারণা ভুল। তুমি কি দেখোনি আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন? বলেছেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝٦٠ [৫. সূরা আর-রাহমান (৫৫), আয়াত : ৬০]

তবে সেজন্য শর্ত হলো, উপকারের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতা থাকতে পারবে না। রিয়া ইবাদতের প্রাণ নষ্ট করে দেয়। তাই রিয়া থেকে বাঁচো।

কারও দুরাবস্থা দেখে হেসো না। কারও মনে কষ্ট দিও না। অযথা কারও আবেগকে আহত করো না।

কারও বাড়িতে মেহমান হলে তার আপ্যায়নে ত্রুটি তালাশ করো না। রান্নার দোষ ধরো না। পরিবেশনের খুঁত বের করো না। শুধু ডাল দিয়ে খেতে দিলেও খুশি প্রকাশ কর। লবণ ছাড়া তরকারি হলেও শোকরিয়া আদায় কর। সামান্য কিছুকেই অনেক মনে কর। তার সকল আপ্যায়নকে নিয়ামত মনে কর। নিজেকে তার অযোগ্য মনে কর। সেজন্য মন থেকে কৃতজ্ঞতা জানাও।

কে জানে, কী আবেগ নিয়ে সে রান্না করেছে! হয়তো সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করেছে। তাই একেবারে দিল থেকে তার শোকরিয়া আদায় কর।

বাদশা হারুনুর রশীদের ঘটনা

কথিত আছে, এক বেদুঈন তীব্র পিপাসা নিয়ে নদীর তীরে গিয়েছে। এরপর তৃপ্তি মিটিয়ে পানি পান করেছে। সেই পানি খুব সুস্বাদু মনে হওয়ায় মশক ভরে নিয়ে এসেছে। মনে করেছে, খলীফার দরবারে পেশ করলে এর জন্য অনেক উপঢৌকন পাওয়া যাবে। সেই মোতাবেক খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে সেই পানি পেশ করেছে।

খলীফা দরবারেই ছিলেন। পানি দেখেই তিনি সব বুঝে গেছেন। তাই উযিরকে বলেছেন, মশকটি রেখে দাও। এখান থেকে শুধু আমিই পান করব। অন্যকেউ যেন পান না করে।

খলীফা হারুন ছিলেন অত্যন্ত দয়ালুপ্রাণ। বেদুঈনকে অনেক উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলেন। আর ভাবলেন, এই পানি অন্যকেউ পান করলে তো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। পানিতে কোনো স্বাদ পাবে না। এরপর বেদুঈনকে সেকথা জানালে সে মন খারাপ করবে।

এই ঘটনা থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। কারও কোনো জিনিসকে মন্দ বললে তার মন খারাপ হয়ে যায়। কখনো হৃদয়টা ভেঙে যায়। এতে কারোই কোনো ফায়দা হয় না। অযথা মনোমালিন্য হয়। অতএব এমন অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখ।

ভালো গুণ ও মন্দ স্বভাব

অন্যের বাড়িতে গিয়ে কর্তৃত্ব দেখাবে না। নিজ থেকেই কোনো কাজ শুরু করবে না। তাদের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কোনো ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করবে না। তাদের বিষয়ে কোনো অভিযোগ করবে না। এতে বিশৃঙ্খলা বাড়ে। তাদের জন্য বিষয়গুলো খুব ভারী হয়ে যায়। মানসিকভাবে তারা আহত হয়।

বাচ্চাদের লড়াইকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বাঁধিয়ো না। কাজের লোকদের যে কোনো কথা শুনতে যেও না। এগুলোর সূত্রে কখনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা ঘটে। তাই তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়গুলো থামিয়ে দাও। পরেও যেন এমন কিছু না ঘটে সেজন্য ব্যবস্থা নাও। চেষ্টা কর যেন এইসব বিষয় দীর্ঘ হতেই না পারে। কারণ বেশি কথা হলেই ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। আর ঝগড়া-ঝাটি সবার জন্যই ক্ষতি বয়ে আনে।

তোমার ভাগে যা আসে তাকে হাজারটার চেয়ে ভালো মনে কর। বাস্তবে হয়তো এটাই তোমার জন্য ভালো। তাই অন্যের জিনিসের দিকে তাকিয়ো না। নিজের জিনিস দেখেই মনভরে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর।

কারও প্রতি হিংসা করো না। হিংসা আল্লাহ তাআলার খুব অপছন্দ। হিংসুক কখনো জীবনে উন্নতি অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা যাকে যা চান দেন। হিংসার মাধ্যমে সেই দান তুমি বন্ধ করতে পারবে না। অযথাই শুধু লাঞ্ছিত হবে। হিংসা মারাত্মক রোগ। এর একটি চিকিৎসা হলো, যার প্রতি তোমার হিংসা হয় এবং যার উন্নতি দেখলে তোমার কষ্ট হয়, তার উপকার করার চেষ্টা করবে। এবং তার জন্য দুআ করবে, হে আল্লাহ! আপনি তাকে আমার চেয়ে উত্তম জিনিস দান করুন।

দ্বিতীয় চিকিৎসা হলো, তার মধ্যে তোমার চেয়ে উত্তম কোনো গুণ থাকলে খুব প্রশংসা করবে এবং এই গুণের জন্য খুব আনন্দ প্রকাশ করবে। এই দুটি কাজ করলে খুব দ্রুতই হিংসা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি মারাত্মক রোগের নাম লোভ। এই রোগ থেকেও বেঁচে থাকবে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে ফেলে, লোভ তেমনি ঈমানকে খেয়ে ফেলে।

নিজের চেয়ে দুর্বল ব্যক্তির দিকে তাকাও। তাহলে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ বুঝে আসবে। হৃদয়ের গভীরে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি তৈরি হবে। কোনো বিষয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিযোগ উঠবে না।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। একান্ত মনে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় কর।

যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়, হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর। সবার সঙ্গেই সুন্দর আচরণ কর। সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। মনে রেখ, সবাই আল্লাহ তাআলার বান্দা। তিনি যাকে চান সম্মানিত করেন। যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। তাই সবার উচিত মহব্বত ও ঘৃণা উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখা। আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহর সকল বান্দাকে তুমি সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা কর। তাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করবেন। দুর্বল, দুঃখী ও নিঃস্বের প্রতি দয়া কর। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি দয়া করবেন।

کَرِمُوا مَہْرَبَانِي تُم أَہْلِ زَمِین پَر
خُدَا مَہْرَبَان ہُوگَا عَرْشِ بَرِین پَر

জমিনবাসীর প্রতি তুমি মেহেরবানী কর। আরশের উপর থেকে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি মেহেরবানী করবেন।

নিজের অবস্থা অনুযায়ী খরচ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক

আমাদের সমাজে অত্যন্ত মন্দ একটি প্রথা চালু আছে। সেটা হলো, মেয়ের বিয়েতে ধনীরা যেমন হাদিয়া উপঢৌকন দেয়, গরিব মিসকীনরাও তেমনই দিতে চায়। সহজে সম্ভব হলে তো ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা সাধ্যাতীত কষ্ট করে। এমনকি ঋণ করে সেগুলোর ব্যবস্থা করে। যার পরিণাম হয় খুবই দুঃখজনক।

অথচ এত কষ্ট করে দেওয়া জিনিসগুলো কিছুদিন যেতে না যেতেই নষ্ট হয়ে যায়! তা দিয়ে তেমন কোনো উপকার তারা লাভ করে না।

যদি আমরা আমাদের আকলকে কাজে লাগাই, বিবেক ও চিন্তাকে ব্যবহার করি তাহলে এরচেয়ে উত্তম কিছু করা যায়। মেয়েদেরকে এমন কিছু কাজ শিখিয়ে দেওয়া যায়, যা তার জন্য দীর্ঘস্থায়ী উপকার ও সুখ বয়ে আনবে। যা দেখে সবার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। মেয়েও খুশি ও আনন্দ লাভ করবে। সবার বাহবা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে।

এছাড়া উপঢৌকন কিছু দিতে চাইলে এমন জিনিস দেওয়া উচিত, যা তার ও তার সন্তানদের উপকারে আসবে। শুধু প্রথা রক্ষার জন্য যেনতেন কোনো জিনিস দেওয়া উচিত নয়। আর চুক্তির ভিত্তিতে কোনো জিনিস দেওয়া তো যৌতুকের শামিল। যা অবশ্য পরিত্যাজ্য!

মোটকথা, মানুষকে খুশি করার জন্য কিংবা প্রথা পালনের জন্য কিছু দেওয়ার চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। প্রথা পালন, লোক দেখানো ও মানুষকে খুশি করার বিষয়গুলো আমাদেরকে সব ধরনের মসিবতে ফেলে রেখেছে। আমাদের চিন্তা ও আমলকে বিপর্যস্ত করে ছেড়েছে। এসবের কারণে কখনো দারিদ্র্য স্পর্শ করছে। কখনো সংকট ঘিরে ধরছে। কখনো হতাশা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো এগুলো আমাদেরকে দ্বীন থেকেই সরিয়ে দিচ্ছে। এরপরও যেন আমরা তা থেকে বের হতে চাই না। বের হওয়ার নীতি ও পদ্ধতি জানা থাকলেও একরকম পেরে উঠি না। মানুষের খুশি-অখুশি আর দুনিয়াবী লাজ-লজ্জা আমাদের উপর এতটাই প্রবল!

আমাদের মনমতো এবং বুঝমতো আমল করা তো উচিত নয়। সব ক্ষেত্রেই খেয়াল রাখা উচিত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনটায় খুশি হন। কীভাবে আমল করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। সে অনুযায়ীই আমাদের কাজ করা উচিত। তাতেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা এবং সর্বময় কল্যাণ।

মানুষ কী বলবে না বলবে, সেই চিন্তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণও এগুলোকে প্রশ্রয় দিতেন না। তারা সব সময় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতেন। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে আমল করতেন। এমন তো নয় যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে ভালোবাসতেন না!

আমরা অতিরিক্ত চাপ ও বোঝা নিয়ে যে কাজ করছি, তারা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজ করতেন। যদি বলি, তারা কিছুই বুঝতেন না! তাহলে ইনসাফ ও বাস্তবতার কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে, আমরা কিছুই বুঝি না। উপরন্তু এ ধরনের চিন্তা আমাদের চূড়ান্ত নির্বোধ হওয়ার প্রমাণ হবে। এবং এসব আমাদের লজ্জিত ও অপমানিত হওয়ার কারণ হবে।

অতএব যথাসম্ভব এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাদের চেয়ে আগে বেড়ে যেও না। সেটা মঙ্গলজনক হবে না। তাদের কথা, চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ কর। নিশ্চয় তারা তোমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন।

বদ অভ্যাস ছেড়ে দাও

বড়দের বসার জায়গা থেকে উপরের জায়গায় বসো না। এটা আদব পরিপন্থী। ছোট মুখে বড় কথা বলার অভ্যাস করো না। বড় বড় কথা বলা আল্লাহ তাআলাও পছন্দ করেন না।

مَت هَنسُو دِيكه كَر تَقدِير كُو پَلٹي كهَاتِي
لَگتِي نَهِين تَقدِير كِسِي كِي پَلٹي كهَاتِي

কারও ভাগ্য খারাপ দেখে কখনো হেসো না। ভাগ্য পরিবর্তন হতে সময় লাগে না।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রাচুর্য নিয়ে গর্ব করো না। এই ধন-দৌলত, জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি সব আল্লাহ তাআলার দান। এতে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা যাকে চান এমন দান করেন। যার কাছ থেকে চান সব নিয়ে নেন। এখানে কারও কোনো ক্ষমতা খাটে না।

প্রয়োজনগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির মনে আঘাত দিও না। নিজের সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করার চেষ্টা কর। তোমার কাছে কেউ তার দুঃখের কথা বলতে চাইলে মন দিয়ে শোন। তার বুকে হাত রেখে সান্ত্বনা দাও। সমবেদনা জানাও। কাউকে খালি হাতে ফেরত দিও না।

خُدَا رَحْم كَرْتَا نَهِين أُس بَشَر پَر
نَه هُو دَرْد كِي چُوٹ جِس كِي جِگَر پَر

আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না, অন্যের ব্যথা-বেদনা শুনে যার হৃদয়ে চোট লাগে না।

ছোট বড় কারও সাথেই শক্ত ভাষায় কথা বলো না। কঠোর ভাষা ও কঠোর আচরণ নির্দয়তার পরিচায়ক। অমানবিকতাও বটে।

কারও প্রতি মন্দ ধারণা করো না। কাউকে কষ্ট দিও না। কারও সঙ্গে দুমুখো আচরণ করো না। লেনদেনের ক্ষেত্রে কথা রক্ষা কর। তোমার কারণে যেন কেউ লজ্জিত না হয়, খেয়াল রাখ।

জিনিসপত্র যত্নের সাথে রাখ। অন্য কারও কাছে আমানত রাখলে বুঝে শুনে রাখ। তার সম্পর্কে জেনে রাখ। কতটুকু কী রাখলে তাকে জানিয়ে রাখ। অলংকার, টাকাপয়সা, কাপড়-চোপড় ও ঘরের তৈজসপত্র রাখলে একটি কাগজে সব লিখে জমা দাও। তাহলে সময়মতো জিনিসগুলো বুঝে পেতে খুব সহজ হবে।

আপন পর সবার সাথেই লেনদেন পরিষ্কার রাখ। কাউকে কিছু বলতে হলে সময়মতো বল। সময়ের পর বললে তেমন কোনো কাজ হয় না। তখন উভয়কেই আফসোস করতে হয়। কিংবা লজ্জিত হতে হয়।

যে কোনো বিষয়ে খুব দ্রুত মানুষকে আশ্বাস দিতে যেও না। নিজের পরিকল্পনার কথা সহজেই কাউকে বলো না। হতে পারে সেই আশ্বাস কিংবা সেই পরিকল্পনা তুমি বাস্তবায়ন করতে পারবে না। তখন উভয়েরই কষ্ট হবে। তোমাকে লজ্জিত হতে হবে।

কাজের লোকদের সামনে পারিবারিক অবস্থা প্রকাশ করো না। অভাব অনটনের কথা পেশ

করো না। এতে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। অপমানিত হতে হয়।

কাজের লোকদের সাথে খুব বেশি স্বাভাবিক হওয়ার দরকার নেই। খুব বেশি গম্ভীর হওয়ারও দরকার নেই। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ কর। তাদেরকে কেবল ধমকের মধ্যে রেখো না। এটা যেমন অভদ্রতা, তেমনি তোমার জন্যও ক্ষতিকর। কারণ, এমন আচরণের ফলে তারা খুব বিরক্ত হবে। তোমার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে এবং তোমার কথার প্রতিউত্তর করতে উদ্যত হবে। যা তোমার জন্য খুবই অপমানকর।

সংকীর্ণমনা লোকদের থেকে দূরে থাক। নিজের মধ্যে সংকীর্ণতা থাকলেও তা দূর করার চেষ্টা কর।

কথা বলার ক্ষেত্রে সময়-সুযোগ বিবেচনা কর। পরিবেশ ও পরিপার্শ্ব খেয়াল রাখ। যেমন, খাবার বিষয়ে আলোচনার মধ্যে কাপড় বিষয়ে আলোচনা শুরু করো না। একজনের প্রসঙ্গে অযথাই আরেকজনকে টেনে এনো না। তাহলে সেই প্রবাদের মতো হয়ে যাবে যে,

گھُٹنا پُھوٹی آنکھ مَارُوں

মারলাম টাখনুতে লাগল চোখে। [অর্থাৎ প্রসঙ্গ একটা, কিন্তু আলোচনা হচ্ছে আরেকটা। এটা খুবই অসুন্দর বিষয়। কখনো বিরক্তির বিষয়।]

অন্যের কথার মাঝে কথা বলতে শুরু করো না। তার কথা শেষ হলে তুমি কথা বল। এমনিভাবে আরেকজনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিও না। অর্থাৎ কেউ কোনো বিষয়ে কিছু বলছে, যে বিষয়টি তোমারও জানা। তাই তার কথা থামিয়ে তুমিই কথাটি বলতে চাচ্ছ। এমন করো না।

চিৎকার চেঁচামেচির অভ্যাস করো না। উঁচু আওয়াজেও কথা বলো না। ধমকের সুর পরিহার কর। শান্ত ও নম্রভাবে কথা বল।

ঘরোয়া জীবনে মহিলাদের মাঝে খুবই মন্দ একটি অভ্যাস দেখা যায় যে, তারা একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়ায়। এটা খুবই খারাপ কাজ। এ জাতীয় আচার-অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখ।

অযথা মানুষের সাথে তর্ক-বিতর্ক করো না। এতে খুবই লজ্জিত হতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে খুবই অপমানিত হতে হয়।

বেশি কথা বলার অভ্যাস করো না। এতে অসতর্কতা বেড়ে যায়। ফলে কখনো এমন কথা বলা হয়ে যায়, যার কারণে পরে খুব আফসোস করতে হয়। কখনো নিজের অজান্তেই অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়ে যায়।

کَم گُفتَن وَ کَم خُفتَن وَ کَم خُوردَن عَادَت بِگِیر

কম খাওয়া, কম ঘুমানো এবং কম কথা বলার অভ্যাস কর।

এসব গুণ অর্জন করতে পারলে জীবনযাপন খুব আরামের হয়। শান্তি ও স্বস্তির হয়।

কাউকে ব্যঙ্গ করবে না। কারও কোনো কথা বা অঙ্গভঙ্গি অভিনয় করে দেখাবে না। হাসিচ্ছলেও কারও কোনো দোষ চর্চা করবে না। কথায় কিংবা কাজে কাউকে খাটো করবে না।

বেশি হাসাহাসি করবে না। বেশি হাসলে দিল মরে যায়। বেশি কথা বলবে না। বেশি কথা

বললে ভুলও বেশি হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসত্য কিংবা অর্ধসত্য কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এক কথা বারবার বলবে না। শ্রোতার জন্য এটা খুবই বিরক্তিকর হয়।

কারও ভুলে যাওয়া ত্রুটিকে স্মরণ করিয়ে দিবে না। অতীতের মন্দ আচরণের কথা বলে লজ্জা দিবে না। সবসময় মানুষের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করার চেষ্টা করবে। অন্যের ভুলের কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হলেও আফসোস করবে না। কারণ, তোমার যা পাওয়ার তা তুমি পেয়েই যাবে।

কোনো জিনিস নিয়ে কারও সাথে বিবাদে জড়াবে না। কেউ সেটাকে নিজের দাবি করলে তাকে দিয়ে দিবে। সেটা দুর্লভ দামি বস্তু হলেও। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমাকে তারচেয়ে উত্তম জিনিস দিবেন এই বিশ্বাস রাখবে।

অতীত কষ্ট কিংবা বর্তমান অস্থিরতা কোনোকিছুকেই মনে জায়গা দিবে না। দুঃখ পেরেশানির কথা সবসময় স্মরণ করবে না। সেগুলো নিয়ে মানুষের সাথে আলাপ আলোচনাও করবে না। এসব ক্ষেত্রে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করবে। আল্লাহর রহমত ও দয়ার কথা স্মরণ করবে।

মনে রাখবে, পেরেশানির দ্বারা কিছুই অর্জন হয় না। ধৈর্য ও দুআর মাধ্যমে সবকিছু হয়। কারণ সবকিছু তো আল্লাহ তাআলার হাতে। তিনিই আমাদের মালিক এবং দুনিয়া আখিরাতের সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান, যাকে চান, দান করেন। তিনি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। কুরআন মাজীদে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ آيه ١٥٣ [৬. সূরা বাকারা (২), আয়াত : ১৫৩]

এরচেয়ে বেশি তুমি কী চাও যে, তোমার মালিক তোমার সাথে থাকবেন! দুনিয়ার সকল আনন্দ এবং দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। তাই সবক্ষেত্রে আখেরাতকে স্মরণ কর।

কেউ যদি তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে মহব্বত করে কিংবা অন্য কোনো চিন্তা থেকে তোমার কোনো কাজ করে দেয়, সেই কাজের মধ্যে দোষ ধরতে যেও না। তবে সম্ভব হলে তোমার কাজ তুমিই কর। অযথাই কাউকে কষ্ট দিও না। কারও থেকে কাজ নিও না।

প্রত্যেক অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ কর। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না সে আল্লাহ তাআলার প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।

যার সঙ্গে পর্দা করার বিধান রয়েছে তার সঙ্গে উত্তমরূপে পর্দা করবে। চেহারা ঢেকে রাখলে, কিন্তু আওয়াজ শুনালে—এটা ভালো নয়। অনেক সময় আওয়াজ শুনলে চেহারার কল্পনা এসে যায়। অতএব এমনটি করবে না। গাইরে মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খুব গুরুত্বের সাথে পর্দা রক্ষা করবে। পর্দার বিধান সবার জন্যই কল্যাণকর, এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে। বাস্তবেই পর্দার উপকারিতা অপরিসীম, সেকথা বলারও অপেক্ষা রাখে না।

বদঅভ্যাস ও দৃষ্টিকটু অঙ্গভঙ্গি থেকে বেঁচে থাকবে। দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো, আঙ্গুল ফোটানো, মজলিসে বসে আঙুল নড়াচড়া করা, মাথা টিপা, মাথা চুলকানো, মানুষের সামনে উঁকুন আনা, কথা বলার সময় হাত কচলানো, ঘাড় মটকানো, বারবার মাথা স্পর্শ করা—সবগুলোই বদঅভ্যাস। এগুলো খুব যত্নের সাথে পরিহার করবে।

নিজের বাড়িতে অপরিচিত কাউকে রেখো না। একান্ত কোনো কারণে রাখতেই হলে যাবতীয় বিষয় তাকে অবগত করো না। এক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন কর। নয়তো গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

সব ক্ষেত্রেই নরম আচরণ করা ঠিক নয়। এতে অন্যরা বেকুব মনে করে কেবল ঠকাবে। তখন মন খারাপ করে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। অপাত্রে নম্রতা এবং সব জায়গায় ভালোমানুষী বেকুবির অন্তর্ভুক্ত।

কাজের লোকদের সাথে এমনভাবে থেকো না যে, তারা তোমাকে বোকা মনে করে। ফলে খিয়ানত করার চিন্তা করে। সেজন্য সব সময় তাদের থেকে হিসাব নাও। তবে অভদ্র আচরণ করো না। নম্রতা ভদ্রতার সাথেই তাদের সঙ্গে আচরণ উচ্চারণ কর। মনে রেখো, যেখানে সেখানে কঠোরতা ভালো নয়। তার দ্বারা লাভের বদলে ক্ষতিই হয়ে থাকে বেশি।

দুআ ও মুনাজাত

দুআর মাঝেই দুনিয়া-আখেরাতের সর্বকল্যাণ

তুমি যদি বিপদ মসিবতে নিরাপত্তা চাও এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা কর, তাহলে দুআ করার অভ্যাস গড়। দুআ হলো বিপদ মসিবতের অবলম্বন। এবং আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

হে আমার বোন! দুআর এই নেয়ামত থেকে নিজেকে মাহরূম করো না। দুআর মাঝে যে শান্তি ও প্রশান্তি তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব না। দুআ করে করে তুমি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পার।

তুমি আমাকে বল, কুরআন মাজীদের এই আয়াত কার জন্য? যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ آية ٦٢ [৭. সূরা নামল (২৭), আয়াত : ৬২]

অর্থ : কে তিনি, যিনি চূড়ান্ত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেন এবং তার কষ্ট দূর করেন?

মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলার কাছে দুআর চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো জিনিস নেই। কেননা দুআর মাঝে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা এবং বান্দার দুর্বলতা ও অক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ হয়ে থাকে। আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ তো খুব দুর্বল হৃদয় থেকে হয়ে থাকে, তবে তার মাধ্যমে পুরো আসমান-জমিন এমনকি আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

বান্দার দুআ আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুত কবুল করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ آية ٦٠ [৮. সূরা মুমিন (৪০), আয়াত : ৬০]

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার কাছে দুআ কর)। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব (তোমাদের দুআ কবুল করব)।

এই ঘোষণার পরও কেন আমরা তাঁকে ডাকব না? কেন তাঁর সামনে হাত প্রসারিত করব না? আর কেনইবা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে মাহরূম হব? আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা পেয়ে কেন ধন্য হব না?

হে আমার বোন! যতদূর সম্ভব নিজেকে এই কল্যাণময় ব্যস্ততায় নিয়োজিত কর। তাহলে মহান মালিকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি খুব সহজেই হাসিল হবে। এতে দুনিয়াতেও তুমি

সৌভাগ্যবান হবে। আখেরাতেও চির সফল হবে।

মনে রাখবে, দুআ হলো আল্লাহ তাআলার কাছে ভিক্ষা চাওয়ার মতো। ভিক্ষার মাঝে অত্যন্ত নীচতা থাকে। এই নীচতা যখন আল্লাহ তাআলার সামনে প্রকাশ পায়, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি খুশি হন। আর দুআ না করা অহংকার ও অহমিকার আলামত। যা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ।

মকবুল দুআর পদ্ধতি

আল্লাহর বান্দা বান্দীদের উচিত সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা এবং দুআ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখা। দুআ যদি দুনিয়ায় কবুল হয় তাহলে তো হলোই। অন্যথা এই দুআ আখেরাতে আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম হবে। নিঃসন্দেহে আখিরাতের ফায়দা দুনিয়াবী ফায়দার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। সেজন্য আখিরাতে সবাই আক্ষেপ করে বলবে, আহা! দুনিয়াতে কোনো দুআই যদি আমার কবুল না হতো!

আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। তিনি যা চান তোমাকে দিতে পারেন। তবে দুনিয়ায় যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী নয়, সেটা অনেক সময়ই তোমাকে দেন না। কিন্তু তুমি না বোঝার কারণে নিরাশ হয়ে যাও। এমন না করা উচিত।

আসলে তুমি আল্লাহ তাআলাকে যত বেশি ভালোবাস, তিনি তোমাকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই তোমার অমঙ্গল করেন না। তিনি তাঁর বান্দা বান্দীদের কল্যাণ ও কামিয়াবী চান। তাদের জন্য যা উপযোগী এবং উপকারী তা-ই প্রদান করেন। যা অনুপযোগী ও অনুপকারী তা দেন না। তাই তোমার উচিত তার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তার সামনে আত্মসমর্পণ করা।

ধনী-গরিব, ছোট-বড় এবং উঁচু-নীচু সবার উচিত তাঁকে ডাকতে থাকা। এবং তাঁর কাছেই সবকিছু প্রার্থনা করা। এতে তিনি খুশি হন এবং রহমত ও বরকত নাযিল করেন। দয়া ও করুণা বর্ষণ করেন।

দুআর সাথে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা শর্ত

হে আমার বোন! তুমি যখন আল্লাহ তাআলাকে ডাকবে এবং তাঁর কাছে কোনোকিছু প্রার্থনা করবে, তখন তাঁর প্রতি দৃঢ় আশা পোষণ করবে এবং দুআ কবুল হওয়ার ইয়াকীন করবে। তাহলে অবশ্যই তিনি তোমার দুআ কবুল করবেন। তোমার প্রয়োজন পূরণ করবেন। নিশ্চয় তিনি দয়ালু দাতা। পরম করুণাময়। আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। এবং আত্মমর্যাদাশীল মহান মালিক।

কেউ যখন তাঁর কাছে কিছু চায়, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা পান। তিনি তো মমতাময়। অত্যন্ত দয়াবান। তিনি তাঁর বান্দা-বান্দীদেরকে নিরাশ করেন না। তাদের সকল প্রয়োজন তিনিই পুরা করেন।

তবে তিনি যেহেতু সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়। যেহেতু তিনি সর্বক্ষমতার অধিকারী, ন্যায়পরায়ণ ও কল্যাণকামী। তাই কারও জন্য কোনোকিছু অকল্যাণ হলে তাকে সেটা দেন না। সেই দুআ তিনি কবুল করেন না। এটা তাঁর একান্তই মেহেরবানী। আপতিত মসিবতকে দূর করে দেওয়াও তার বড় দান এবং বড় অনুগ্রহ। তিনি তো সবকিছুর পরিণাম ও পরিণতি জানেন। যা অন্যকেউ জানে না। তাই দুআ করে নিরাশ হয়ে যাওয়া তাঁর নেয়ামতের প্রতি

অকৃতজ্ঞতার শামিল। কারণ তুমি তো জানতে না— হয়তো কোনো মসিবত তোমার উপর আসছিল, দুআর উসিলায় যা দূর হয়ে গেছে। অথবা যা চেয়েছ তা পেয়ে গেলে তুমি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে। তিনি তা না দিয়ে তোমাকে রক্ষা করেছেন। অতএব আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

মনে রাখবে, তিনি যখন তোমাকে দুআ করার তাওফীক দিয়েছেন নিশ্চয় তা কবুল করবেন। সেটা হয়তো প্রকাশ পাবে দুনিয়াতে কিংবা আখেরাতে। আর দুআ করার তাওফীকও তো তাঁর অনেক বড় নেয়ামত। সেই নেয়ামতের প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ থাক।

বিপদ-মসিবতের সমাধান দুআর মাঝে

বর্তমান যামানা তো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ যামানা। কিয়ামতের নিকটবর্তী যামানা এটা। এ সময় চিন্তা ও পেরেশানীমুক্ত একটি দিন পেলে সেটাকেও গনীমত মনে কর। নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকার যামানা তো পার হয়ে গেছে। এখন একের পর এক বিপদ মোকাবেলা করার যামানা। বর্তমানে তুমি যে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছ সেটার আগে পরেও অনেক বিপদ মসিবত রয়েছে। তাই সবসময় এভাবে দুআ কর—

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ [৯. দুআটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ১৭৬২৮]

হে আল্লাহ! সকল কাজের পরিণতিকে আমাদের জন্য সুন্দর করুন। দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার প্রতি রহম করুন। আমাদেরকে সকল বিপদ মসিবত থেকে রক্ষা করুন। সকল মন্দ পরিণতি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তো দুআ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। মসিবত ও মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো অবলম্বন নেই। এখন তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলছি, যদি সেটা কর তাহলে ইনশাআল্লাহ সকল বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। সকল মসিবত থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাঁর কুদরত দিয়ে হেফাযত করবেন।

আমলটি হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এবং বিশেষভাবে ফরয নামাযের পর হাত তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে সকল অকল্যাণ থেকে পানাহ চাইবে। সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করবে। এভাবে নিয়মিত দুআ করতে থাকবে। দেখবে, আল্লাহ তাআলা তোমার দুআ কবুল করবেন। তোমাকে সকল অকল্যাণ থেকে হেফাযত করবেন। এবং সকল মসিবত থেকে রক্ষা করবেন।

দুআর চেয়ে উত্তম আমল আর কী আছে? হাদীস শরীফে এসেছে,

لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ [১০. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৮৭১; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৮১৮]

দুআর ক্ষেত্রে তোমরা অক্ষম হয়ো না। কেননা দুআ করে কেউ কখনো ব্যর্থ হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তুমি আমার কাছে চাও। আমি তোমাকে অবশ্যই দিব। [১১. সূরা মুমিন (৪০), আয়াত : ৬০] স্বয়ং দয়ালু মালিক যখন ওয়াদা করেছেন—

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿١٨٦﴾ [১২. সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৬]

কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই।

আমি অবশ্যই দিব, তখন কি আর খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন? তোমার কি তাই মনে হয়! উপরন্তু হাদীস শরীফে এসেছে,

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ [১৩. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৩৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৯০]

দুআ ছাড়া কোনোকিছুই তাকদীরকে বদলাতে পারে না।

অতএব দুআর ব্যাপারে গাফলতি করো না। দুআর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা কর। দুআর মাধ্যমেই সব ধরনের খাইর ও বরকত লাভ কর।

দুআর বরকত ও প্রতিদান

প্রতিদিন তুমি কত ধরনের কাজ কর। সারাক্ষণ দুনিয়ার ধান্ধায় থাক। কঠোর পরিশ্রম কর। ক্লান্ত হও। আমি বলি, এর ভিতর থেকেই তুমি একটু সময় বের কর। সেই সময়টুকু দুআর মধ্যে ব্যয় কর। আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের সকল অবস্থা পেশ কর। সকল প্রয়োজন তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। এভাবে যদি দুআর প্রতি গুরুত্ব দাও, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি অনেক লাভবান হবে। তুমি আল্লাহ তাআলার যিম্মায় থাকবে এবং তিনি তোমার সবকিছুর দায়িত্ব নিয়ে নিবেন।

দুআর মাধ্যমে আমি কতকিছু লাভ করেছি, আমি জানি। সেজন্য আমি আমার দয়ালু মালিকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারব না।

مَیں کِس قَابِل تھِي اے لوگُو جَهَاں مَیں
مَگَر سَب کُچھ دِیَا اُس نَي بَلَا کَي

হে লোকসকল! আমি তো এই দুনিয়ায় কোনোকিছুরই যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে সবকিছু দিয়েছেন।

দুআ এমন এক শস্যক্ষেত্র, যার উপর দিয়ে কোনো অকল্যাণী বাতাস বইতে পারে না। দুআ এমন এক বাগান, যার কোনো ফল বিস্বাদ হয় না। দুআর প্রতিটি ফল হয় মিষ্টি ও সুস্বাদু। দুআ হয় সকল রোগের মহৌষধ।

তবে শর্ত হলো, দুআ করার পর আল্লাহ তাআলার প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমি অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে জিনিসটি পাব। খালি হাতে আমি ফিরব না। পেতে দেরি হলেও দুআ করা বন্ধ করব না। এই রকম বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা থাকলে অবশ্যই তুমি যা চাও পেয়ে যাবে।

এখন আমি তোমাকে দৈনন্দিন জীবনের কিছু আমল অযীফা বলে দিচ্ছি। এগুলোকে যদি গুরুত্বের সাথে পালন কর, ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে খুবই উপকৃত হবে। সকল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে। সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

সকাল-সন্ধ্যার আমল

সকাল-সন্ধ্যায় ১০০ বার করে পড়বে—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

এটি অত্যন্ত বরকতময় আমল। নিয়মিত এই আমল করলে তোমার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে। হাদীস শরীফে এসেছে, এই বাক্যদুটি আল্লাহ তাআলার কাছে খুব প্রিয়। বাক্যদুটি উচ্চারণে খুব হালকা হলেও মীযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। [১৪. সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৭৫৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯৪]

এর সঙ্গে ১০০ বার ইসতিগফার ও ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে নাও। যাতে সারাদিনে কোনো গোনাহ হয়ে গেলে ইসতিগফারের উসিলায় মাফ হয়ে যায়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তিলাওয়াতের সূরা

পুরো কুরআন মাজীদ মুখস্থ থাকলে তো ভালো। না হয় কয়েকটি সূরা মুখস্থ করে নাও। অন্তত পাঁচটি সূরা অবশ্যই মুখস্থ করে নাও। এরপর নিয়মিত সেগুলো তিলাওয়াত কর।

ফজরের পর সূরা ইয়াসীন, যুহরের পর সূরা ফাতহ, আসরের পর সূরা নাবা, মাগরিবের পর সূরা ওয়াকিয়াহ এবং এশার পর সূরা মুলক।

সবগুলো মুখস্থ করতে না পারলে কমপক্ষে সূরা ইয়াসীন, ওয়াকিয়াহ ও মুলক অবশ্যই মুখস্থ করে নিবে। সূরা ইয়াসীনের বরকতে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। [১৫. দ্রষ্টব্য, সুনানে দারেমী, বর্ণনা নং: ৩৪৬১, ৩৪৬২]

সূরা ওয়াকিয়াহর ফায়দা আখেরাতে তো আছেই। দুনিয়াতেও এর আশ্চর্য ফায়দা রয়েছে। সেটা হলো, নিয়মিত এই সূরা তিলাওয়াত করলে কখনো সংকট ও অনাহার তোমাকে স্পর্শ করবে না। [১৬. শুআবুল ঈমান-বায়হাকী, হাদীস নং : ২৬৬৯ আরও দ্রষ্টব্য তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ (হাফেয যাইলায়ী রহ.-কৃত ৩/৪১১) এবং লিসানুল মীযান ৪/২৩৬; ৯/৯০-০২]

আর সূরা মুলক তোমার কবরের সাথী হবে। এই সুরার উসিলায় কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। [১৭. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৯০]

আশা করি তুমি এই সূরাগুলোর প্রতি খুব আগ্রহী হবে। আর এই আগ্রহের মাধ্যমে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাপক কল্যাণ লাভ করবে। সব ধরনের ক্ষতি থেকে হেফাযতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ আমল : আল-হিযবুল আযম

আল-হিযবুল আযমের আমলটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাতে সাতটি মঞ্জিল রয়েছে। সপ্তাহের সাতদিনে সেগুলো পড়বে। প্রথম মঞ্জিল শুরু করবে শনিবার থেকে। এরপর জুমার দিন সপ্তম মঞ্জিল পড়ে খতম করবে। এভাবে প্রতি সপ্তাহে একবার করে খতম করবে। এবং নিয়মিত এই আমল জারি রাখবে। এটা তো এমন উঁচু মানের অযীফা যে, বছরে এক খতম বরং পুরো জীবনে এক খতম পড়লেও তার ফায়দা থেকে মাহরূম হবে না।

কারো থেকে ইজাযত নিয়ে পড়া শুরু করলে ভালো। সেটা ছাড়াও পড়া যাবে। দুআগুলোর সঙ্গে যেসব টীকা যুক্ত করা হয়েছে সেগুলোর দিকেও দৃষ্টি দিবে। তাতেও অনেক ফায়দা

হবে। অনুবাদসহ যেটি পাওয়া যায়, সেটি দেখে পড়লে আরও ভালো। সেখান থেকে মাঝেমধ্যে অনুবাদও দেখবে।

তুমি যদি বল, আমি ভালোভাবে দুআ করতে পারি না। তাহলে তো এই কিতাব তোমার জন্য অনেক বড় নেয়ামত হবে। কিতাবটিতে কেবলই দুআ সংকলন করা হয়েছে। আর সেগুলো নেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীস থেকে। সুতরাং এরচেয়ে উত্তম দুআ আর কী হতে পারে?

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, অনেক মেয়েরা বলে, দুআর কিতাব পড়তে ভালো লাগে না! আজকালের মেয়েরা তো নিজেদেরকে চিনতেই পারে না। নিজেদের মর্যাদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদের চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত নীচু। তাদের ঈমান-আমল অত্যন্ত দুর্বল। তাই তো দেখা যায়, অনেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের দেখে ঈর্ষা করে। তাদের চলাফেরা অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। সামর্থ্য না হলেও তাদের মতো থাকতে চায়।

পক্ষান্তরে ইবাদতগুযার কোনো মেয়ে দেখলে হয়তো প্রশংসা করে। কিন্তু তার মতো হতে চায় না। তার মতো মেহনত ও সাধনা করতে প্রস্তুত হয় না। এটা ঈমানের দুর্বলতা নয় তো কী? এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। এটা তাদের আত্মভোলা মানসিকতা এবং নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এমন অবস্থা থেকে উদ্ধার করুন। আমীন।

তাসবীহে ফাতেমী ও দরূদ শরীফ

প্রিয় মেয়েরা! ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নামায। তাই ঠিক সময়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় কর। খুব ধীরস্থিরভাবে রুকু সিজদা কর। তাড়াহুড়া করো না। নামাযে ভুল করো না।

নামাযের পর নিয়মিত কিছু আমল অযীফা আদায় কর। দরূদ শরীফ ও কিছু তাসবীহ পাঠ কর। ইসতিগফার কর। কালিমায়ে তায়্যিবা পড়। কালিমায়ে তাওহীদ পড়। কমপক্ষে এগুলো অবশ্যই কর।

রাতে ঘুমানোর সময়ও কিছু আমল কর। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ। ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ। এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়। এটিকে তাসবীহে ফাতেমী বলে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে ফাতেমা রাযি.কে এই আমল দিয়েছিলেন।

হযরত ফাতেমা রাযি. তাঁর বাবা দোজাহানের বাদশা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। একজন দাসী পাওয়া গেলে খুব ভালো হতো। তখন বাবা তাঁর প্রিয় মেয়েকে বললেন, ফাতেমা! আমি কি তোমাকে এমন কিছু দিব যা দাসীর চেয়েও অনেক বেশি উত্তম? এরপর এই তাসবীহ বলে দিলেন। [১৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৭]

সুতরাং সকল মেয়ের জন্যই আমলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমলটি খুবই উপকারী। তোমরাও এই আমল করলে তোমাদের কোনো দাসী লাগবে না। আর দাসী তো সবাই রাখতেও পারে না। তাই আমলটি খুব আগ্রহ নিয়ে করতে থাক।

আরও কয়েকটি দুআ মুখস্থ করে নাও। দুআগুলো খুবই সহজ এবং সুন্দর। মর্মসমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

দুআ:১
اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ
অর্থ : হে আল্লাহ! সকল কাজের পরিণতিকে আমাদের জন্য সুন্দর করুন। দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

দুআ : ২
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।

দুআ : ৩
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন।

সাত আয়াতের অযীফা

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সাতটি আয়াত সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত পাঠ করলে বিপদ-মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তুমি হয়তো জানতেই পারবে না, কী কী মসিবত তোমার উপর আসছিল। এরপর এই আমলের উসিলায় সেগুলো দূর হয়ে গেছে। আয়াতগুলো মুখস্থ করে নাও—

১. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آيه ٥١

২. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ آيه ١٠٧

৩. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آيه ٦

৪. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آيه ٥٦

৫. وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آيه ٦٠

৬. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آيه ٢

৭. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ آيه ٣٧

আয়াতগুলোর তরজমা :

১. অর্থ : বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য (তাকদীরে) যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত। —সূরা তাওবা, ৫১

২. অর্থ : আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দান করেন, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা দূর করবে এবং তিনি যদি তোমার কোনো মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা ইউনুস, ১০৭

৩. অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। তিনি তাদের স্থায়ী ঠিকানাও জানেন এবং সাময়িক ঠিকানাও। সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। —সূরা হুদ, ৬

৪. অর্থ : আমি তো আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। ভূমিতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার ঝুঁটি তাঁর মুঠোয় নয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে (অর্থাৎ সরল পথে চললেই তাঁকে পাওয়া যায়)। —সূরা হুদ, ৫৬

৫. অর্থ : এমন কত জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দান করেন এবং তোমাদেরকেও। তিনিই সব কথা শোনেন, সকল কিছু জানেন। —সূরা আনকাবূত, ৬০

৬. অর্থ : আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই। আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। —সূরা ফাতির, ২

৭. অর্থ : তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদেরকে) বল, তোমরা বল তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের)কে ডাক, আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমত ঠেকাতে পারবে? (অর্থাৎ পারবে না) বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তো তাঁরই উপর ভরসা করে। —সূরা যুমার, ৩৭

এর পরে আর বইটি স্ক্যান করা নেই, আর আমার জানাও নেই যে এরপর আর আছে কিনা। আসলে বইটা হার্ড কপিও পাচ্ছি না কলেজ স্ট্রীট , কলকাতা তে। তাই এখানেই সমাপ্ত করতে হল। কেউ জানলে এই লিঙ্ক এ ক্লিক করে জানাতে পারেন।

অথবা এই মেইল এ জানাতে পারেন –

Boiwala1594@gmail.com